পালাবদল

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স

কলিকাতা-৭০০০০৯

PALABADAL

প্রথম প্রকাশ ঃ

এপ্রিল ১৯৬১

প্রকাশিকা ঃ

অপর্ণা জানা

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ ঃ

জে. ডি. প্রেস

৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ

সুধীর মৈত্র

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ

ওয়েলনোন প্রিন্টার্স

১২৪/বি, রাজা রাম মোহন সরণী

কলকাতা-৭০০০০৯

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সোনামন মুখোপাধ্যায়

করকমলেষু

মিঠুর কথা

আমরা অভিজাত বংশের—এ কথাটা শোনার ভিতরে এক ধরনের অহঙ্কার কাজ করে। কেননা, ইংরেজরা এ দেশ ছাড়া হলেও আমরা আভিজাত্যের সু-উচ্চ মিনার থেকে নিচে নেমে আসতে পারিনা। কিংবা এ-ও বলা চলে, আমরা আভিজাত্যের খোলসটা শরীরে জড়িয়ে রেখে সাধারণের থেকে দূরে সরে থাকতে ভালবাসি। অথচ, আমরা বর্তমানে যে কী—তা হিসেব কষতে ভুলে যাই।

দু মহলা বাড়ির পলেস্তরা অনেকদিন আগে থেকেই খসতে শুরু করেছে। একে পুরোপুরি খসিয়ে ফেলে ঝকঝকে তকতকে করার সদিচ্ছা কী কারো আছে? নাকি, দেখেও দেখতে পায় না কেউই। শুনেছি দু একজন কৃৎকর্মা মানুষ ছিলেন এ পরিবারেই। ওঁদের ক'জনের চেষ্টাতেই এ বাড়ির জাঁকজমক, ঠাটবাট প্রাচীন কলকাতার অনেক অভিজাত পরিবারের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে ছিল। বেশ কয়েকটা শ্বেত পাথরের ফলক ধুলো-বালি মাখামাখি হয়ে এখনও বাড়ির সঙ্গে সেঁটে আছে। জজ, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এ পরিবারেই যে ছিল তা আদৌ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বিশ্বাস না করেও তো পারি না। কেননা, ওখানে কোনই ভেজাল ছিল না। নিখাদ সত্য বলে মনে করতে কোনই সংকোচ হয় না।

জাঁকজমক বজায় রাখার জন্য এ বাড়িতেই বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগে থাকত। এখন সেটা অনিচ্ছাসত্ত্বে না কায়ক্লেশে বজায় রেখে চলেছে বুঝে উঠতে পারি না। বুঝে উঠতে পারি না এ বাড়ির সত্যিকারের চেহারাটা।

এ বাড়িরই মানুষজন এককালে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনে, ও সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। শিক্ষার আলোকে আলোকিত হোক এ-ও নাকি ছিল এ বাড়ির মানুষদের চিন্তার বিষয়। এবং এজন্যই বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অকৃপণভাবে এঁরাই অর্থ সাহায্য করতেন। এসব ভাবলে, বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়।

এককালের আভিজাত্যের উর্দি গায়ে চাপিয়ে বসে থাকব কেন এখনও? কি আছে এখন?

বাইরের লোক টের না পেলেও অন্দর মহলের মানুষরা এটাকে সগৌরবে

আঁকড়ে ধরে বসে আছে। সকলেই যে আমরা একটা মিথ্যার দুর্গে ঠাঁই গেড়ে বসে আছি, তা এ বাড়ির দু'একজন ছাড়া আর কেউই বুঝতে চায় না।

প্রতিদিন সকালে ছোটো খাটো ব্যাপার নিয়ে মেয়েমহলে যে সব কথা হয় তাকে কথা না বলে নোংরা ঘাঁটা বলা চলে। তাতে আভিজাত্যের অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য! ক্লিন্ন, জীর্ণ, দগদগে ঘা নিয়ে সকলে বেশ আত্মতুষ্ট হয়ে দিন যাপন করে।

পুরুষরা বলাবলি করে, মেয়েদের ব্যাপার, ও মেয়েরাই সামলাক, আমাদের কি? বাড়ির পুরুষ মানুষগুলো যদি সত্যিকারের পুরুষ হ'ত' তাহলে ওরা বুঝতে পারতো, কী সর্বনাশের কবর ওরা খুঁড়ে চলেছে। হা হতোস্মি! ছেলে মেয়েরা বেহায়া হচ্ছে, নির্লজ্জ ও অশালীন আচরণ করছে, আর এতে যে পরিবারের আভিজাত্য ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে সেটা কেউ-ই ভাবে না।

সম্মান পেতে গেলে যে সৌজন্য ও রুচির দরকার তা এবাড়ির ক'জনার আছে? অপরকে অসম্মানিত করলে নিজেই যে অসম্মানিত হয়, এ বোধ বুদ্ধি এ বাড়ির অধিকাংশেরই নেই। সেটা আমি আমার বাবাকে দেখেই বুঝতে পারি।

আমার বাবা রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দালালি করে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হোল্ডার হয়েও খুব কৃপণ স্বভাবের। বাড়িতে বাবাকে সকলে গণা কাকা বলে ডাকে, এই সুবাদে পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে বাবা গণা কাকা। এ বাড়ির কেউই বাবাকে ঠিক পছন্দ করে না। আমার এই আঠারো বছর বয়সেই আমি বুঝতে শিখেছি অনেক কিছু, বাবার এমন কোন গুণ নেই যার জন্য বাবাকে সকলে পছন্দ করতে পারে। যাই হোক, বাবা তো! সেজন্য আমার মন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকত সর্বক্ষণ। কলকাতায় আমরা প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো বাসিন্দা। কলকাতা তখন কেমন ছিল সে সবই ঠাকুর্দা নরেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনেছি। আমার ঠাকুর্দাও এ-সব কাহিনী শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার কাছ থেকে। পুরনো দিনের কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে। ও আমলের অনেক ছবি আমাদের সুবিশাল বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো আছে এখনও। সামন্তরাজাদের মত পোশাকে-আশাকে ওঁদের ভীষণ বেমানান মনে হয়। কেন জানিনা, বর্তমানের এ বাড়ির শ্রীছাঁদ দেখে আমার মধ্যে আভিজাত্যের গোপন নদি প্রবাহিত হয় না।

বাবার দীর্ঘ শরীর, উজ্জ্বল গায়ের রং, উন্নত নাক, চওড়া কাঁধ, ঝকঝকে

এক জোড়া চোখই যেন আর দশ জনের থেকে পৃথক। আমার মা চারুশীলা সম্রান্ত ও বিত্তজনের কন্যা। রূপে ও গুণে মা অতুলনীয়া। আমার দাদার নাম সূর্যকান্ত। সূর্যের দীপ্তি ওর মধ্যে কিছু মাত্রও নেই, কিন্তু কান্তিতে আছে মুখুজ্জে বংশের উজ্জ্বলতা। কেউ কেউ বলে আমি নাকি মা-র চেয়েও সুন্দরী। আর সেজন্য আমার অহংকারও কম নয়।

বাড়িটা যত বিশালই হোক, ভেতরটা নোংরা ও আবর্জনায় আকীর্ণ। ছ' মহলা বাড়ি আমাদের। আমাদের ভাগে পড়েছে বড় রাস্তার ওপরে দোতলায়। সাকুল্যে আড়াইখানা ঘরের মালিক আমরা। যুবতী মায়ের একখানা ছবি বাবার মতন মানুষও বেশ খরচ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছে।

বাড়িটায় সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এমন সব কাণ্ড কীর্তি হয় যা এক কথায় ভীষণ অস্বাস্থ্যকর। আমার কত যে জেঠী, কাকী, দাদা, ভাই, জেঠা, কাকা আছে, তার সীমা সংখ্যা নেই। সকলের নাম ভাল করে সব সময় মনেও করতে পারি না। আজ সকালেই আমার ন'জেঠীমার সঙ্গে সম্পর্কিত রাঙা কাকীমার যে সব সংলাপ চালাচালি হ'ল, তা একটু না জানালে আমার বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণিত হবে না। কি নিয়ে গণ্ডগোল বেঁধেছিল, তা অনেক পরে বুঝেছি।

রাঙা কাকীমা রাগী গলায় বলছিল, 'রামবাগানের মেয়ের সতী হওয়ার সখ।'

'কে কাকে অসতী বলে যে ছেনাল মাগী! নিজের পুরুষে মন বসে না বলে যে কিনা রোজ এ বয়সে দুপুরে ঢলানি করে ঘুরে বেড়ায়, তারই মুখে বড় বড় কথা। ন'জেঠীমা রাঙা কাকীমা-কে উদ্দেশ্য করে এ সব আওড়ায়।

এ নিয়ে ওদের ঘণ্টা দুয়েক উতোর চাপান চলে। চারপাশের বারান্দায় ভিড় জমে যায়, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে আমার পরমাত্মীয়ারাও এ ওর গায়ে ঢলে ঢলে পড়ে। এ সময় বয়স্কদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। কেননা, মহিলাদের ব্যাপারে পুরুষদের নাক গলানোর কোন অধিকারই নেই এ বাড়িতে। আমার দাদা সূর্যকান্ত বাড়ির মেয়েদের দিকে তাকিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে ওদের দেহকে লেহন করে। এ বাড়ির পুরুষদের চোখের ভাষা আমি পড়তে শিখেছি। গত বছর এক অলস দুপুরে ঘণ্টু কাকা আমাকে চিলে কোঠার ছাদে নিয়ে গিয়ে চুমু খেয়েছিল। আমার বুকে মুখ গুঁজে খুব কান্না কেঁদেছিল। আমি অবাক হয়ে ওকে বোঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ব্যাপারটা যে মোটেই সামাজিক নয়, এটা বোঝবার মত জ্ঞান বুদ্ধি, সে সময় আমার হয়েছিল।

ঘণ্টু কাকা শুধু বলেছিল, 'এ সব যেন কাউকে আমি না বলি।

আমি বলিনি সেটা লজ্জায় না ঘেন্নায়, তা বলতে পারবো না।

মায়েরা বোধ হয় সবই টের পায়।

পনেরো-তে যেবার পা দিয়েছিলাম সেদিন কি তার পরের দিন মা বলল, 'মিঠু, এবার থেকে এটা পরিস। কাঁচুলিটা তুলে ধরে মা হাসতে হাসতে বলেছিল, এখন তোর বয়স হচ্ছে, এবয়সের ভার বড় ভার।'

আমার খুব হাসি পেয়েছিল সে কথায়, আর কেমন গর্বও। মা-র সামনেই ফ্রক খুলে ফেলতেই মা বিস্ময়াভিভূত হয়ে আমার বুকের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোর শরীরে কেউ হাত দেয় না তো? ...া বাড়ি! বড় ভয়ে ভয়ে থাকি।

আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁচুলি পরতে গিয়েই কেমন হোঁচোট খেয়েছিলাম। নিজেকে দেখে নিজেই মোহিত হয়েছিলাম।

এ ঘটনা ঘটার দু বছর আগের একটা দিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। উরু বেয়ে টাট্‌কা রক্ত ঝরে পড়েছিল। আমি ভয় পেয়ে মাকে বলতেই মা আমাকে জোর করে ধরে ঘরের দরজা বন্ধ করে স্মিত হেসে বলেছিল, 'এরকম এখন থেকে প্রতি মাসেই হবে।'

'যতদিন বাঁচবো, ততদিন?' শুকনো খড়খড়ে গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম মাকে।

মা হাসতে হাসতে আমাকে ঠিক-ঠাক করতে করতে বলেছিল, 'তাই কি কখনো হয়? বড় জোর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বয়স পর্যন্ত এ রকম চলবে।'

এর পরই অনেক কথা মাতে আমাতে হয়েছিল।

মা-র দেওয়া নতুন উপহারে নিজে যে পূর্ণ হতে চলেছি, তা মনে মনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

মা বলেছিল, 'তোর এ বয়সে আমি মা হয়েছিলাম।' মা গম্ভীর হয়ে গেল। বেশ দুঃখী গলা করে বলেছিল, 'ছেলেটা বেঁচে থাকলে বেশ হ'ত।' গাঢ় শ্বাস ফেলে মা জর্দা পান মুখে দিতে দিতে বলল, 'মেয়েদের অনেক জ্বালা! কই তুই আমার কথার উত্তর দিলি না তো?'

মিথ্যে বলেছিলাম মাকে, 'কী বলছো মা? তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কেউই আমাকে ছোঁয় নি, আমাকে স্পর্শ করার স্পর্ধা এ বাড়িতে কারুর নেই।'

দেখিস বাপু! যা দিনকাল। কথা ক'টি বলেই মা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

এর ক'দিন পরই নারাণ জেঠুর খবর পেলাম। খুব ভোরে নারাণ জেঠু তার মেয়ে কুইনকে নিয়ে দেওঘর না মধুপুর চলে গেল। কেন গেল, কবে ফিরবে, তা কিছুই বলে যায়নি নারাণ জেঠু। শুধু ভাগের ঘরে নামী কোম্পানীর বড় তালা ঝুলিয়ে চলে গিয়েছে।

বাড়িতে মেয়েমহলে নানান ধরনের ফিসফাস আলোচনা হতে লাগল। কখনো হাসি, কখনো চূড়ান্ত নিস্তব্ধতার মাঝে আমি এ-ঘর ও-ঘর করি, সঠিক কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। মাকে সে কথা জিজ্ঞেস করতেই মা সাবধানী ভঙ্গিতে যা বলেছিল, সে কথায় আঁতকে উঠেছিলাম আমি। কুইন আর তার খুড়তুতো ভাই লান্টুর কাণ্ডকীর্তির কথা শুনে লজ্জায়, ঘেন্নায় আমি চুপসে গিয়েছিলাম।

মা শুধু বলেছিল, 'ভাসুরঝি খালাস হয়ে সুস্থ শরীরে ফিরে এলেই বাঁচি।'

আশ্চর্য! এতে মা'র মরা বাঁচার কী আছে? আমি প্রশ্ন করতেই মা বলেছিল, এটা মুখুজ্জে বংশের মর্যাদার প্রশ্ন। লোক জানাজানি না হয় ঠাকুর। বলেই অজ্ঞাত, অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে মাকে হাত জোড় করে কপালে ঠেকাতে দেখেছিলাম।

আমার দাদা সূর্যকান্ত রোজই সিদ্ধির নেশা করে বাড়ি ফেরে। বাবা ওকে খুব যত্নআত্তি করে। দাদা সহাস্যে বলল, 'তোমরা সব এমন সব ক'চ্ছো যেন, এ বাড়িতে এরকম ঘটনা এই প্রথম ঘটলো। তোমাদের নিয়ে আর পারি না। ঘি আর আগুন পাশাপাশি থাকলে তো এমনটা হবেই। ওই তো ছাখো না গে, বিজনদার বিছানায় সুমি ঝি শুয়ে খিলখিল করে হাসছে। আমার তো মনে হয়, বিজনদা ওর পা টিপে দেবে একটু বাদেই। এ বাড়ির লোকদের কি চেনো না?

এত কিছুর মাঝে আমার বাবাকে রেসের বইয়ে ডুবে থাকতে দেখি। অন্যান্য ঘরগুলোতেও ওই একই দৃশ্য। নয়তো কোথাও বা ছেলে-মেয়ের সামনে মদের ফোয়ারা ছোটে। দাদার নাকি মদে মৌতাত হয় না। ঘরে ঘরে রেডিও, নয়তো স্টিরিয়োতে গান বাজছে ঝমাঝম শব্দে, লেখাপড়ার নামগন্ধও নেই এ বাড়ির পরিবেশে। কোন রকমে এইট নাইন পাশ করলেই আত্মীয় স্বজনদের জোর সুপারিশে চাকরিও জুটিয়ে ফেলে এই মন্দার বাজারে। মন্দার বাজার টের পাই, খবরের কাগজে মাঝে মাঝে চোখ বুলোই বলে।

দোল, দুর্গাপূজা আর বারো মাসে এটা-সেটা লেগেই থাকে আমাদের বাড়িতে। প্রাচীন আভিজাত্যের সলতেটা নিভতে নিভতেও নেভে না। যেই না কোন উৎসব আসে বাড়ির কর্তারা এক হয়ে যায়। চোরবাগানে আমাদেরই বংশের আর একটি শাখার সঙ্গে এ বাড়ির অহি-নকুল সম্পর্ক। ওরা কি করছে না করছে সে সবই এ বাড়িতে ঠিক খবর চলে আসে, আবার এ বাড়ির খবর ও বাড়িতে অজানা থাকে না। পুজোর মাস খানেক আগে থেকেই আমাদের এ হেন খোস পাঁচড়ায় ভরা বাড়িটাতে সারাইয়ের কাজ শুরু হয়, চুনের প্রলেপ লাগে। ঠাকুরদালানে বউরা সতীলক্ষ্মীর মত লালপেড়ে শাড়ী পরে পুজোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমার ভীষণ হাসি পায় এসব দেখে। বাজারের থলে সকলেরই আলাদা। বাজার যাই হোক আর না হোক, মদের বোতল সংগ্রহ করতে ওরা কেউই ভুল করে না। এছাড়া একতলার দক্ষিণের ঘরে সতরঞ্চ পেতে সারারাত ধরে চলে তিনতাসের খেলা। শুধু বাড়ির লোকই এখানে ঠাঁই পায় না, পেয়ারের উঠতি পয়সাওলারাও এ আসরে ঠাঁই পেয়ে যায়। বাপ-কাকা-জেঠাদের সঙ্গে উঠতি বয়সের ছেলেরাও এ আসর জমিয়ে তোলে। আর মেয়েমহলেও গাদা পেটাপেটি খেলা হয়। ওসব জায়গায় আমার যাওয়ার বারণ নেই। খেলার মাঝে ওদের যেসব খোস মেজাজী কথা হয়, তাতে প্রথম প্রথম একটু লজ্জা পেতাম বটে, এখন ও সবই একদম গা সওয়া হয়ে গেছে। ওদের মুখের কোন লাগাম নেই। এমন অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি আর কুৎসিত কদাকার সব মন্তব্য যে এমন অবলীলায় করতে পারে, তা শুনে অবাক হই, লজ্জা পাই, ঘেন্না ও দুঃখ দুই-ই হয়। মধ্যবিত্ত বাড়ির মা-কাকীরাও কি অলস দুপুরে এমন ধরণের আচরণ করে? কি জানি? হয়তো সব বাড়িতেই এ ধরনের অশ্লীলতা লোকচক্ষুর অন্তরালেই হয়ে থাকে। জিজ্ঞেস করতে হবে ভারতীকে, নয়তো বা শ্রাবণীকে। ওদের দু'জনার সঙ্গেই তো আমার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব। কিন্তু ফ্যাসাদে পড়লাম খুবই। দুম করে কি ওদের এরকম কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যায়? অনেক চেষ্টা আমার সম্পূর্ণ বিফল হল। মনের এই ক্ষুধিত অবস্থা আমি কিছুতেই প্রকাশ করতে পারলাম না। শুধু কি এই? বিরক্তি আর অতৃপ্তি এই দু'য়ের সংমিশ্রণ ক্রমশই আমাকে জটিল জলস্রোতের দিকে ঠেলে দিল। আমার প্রতিদিনই মনে হতে লাগল, এর জন্য দায়ী ঘন্ট, কাকা। কেন সেদিন ও আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল? ও কান্নার কী অর্থ হয়, তা কি আমার কাছে চিরকালই দুর্জ্ঞেয় থেকে যাবে? মানুষ কেন

কাঁদে ? দুঃখের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে মানুষ কাঁদে জানি, কিন্তু ঘণ্টু কাকার তো কোন দুঃখ ছিল না। এর ওপর ছিল মা'র বে-হিসেবী আচরণ। মা দুপুরে মাঝে মাঝে অল্পবয়সী মেয়েদের মত সেজে কোথায় যে যায়, আজও আমি তা জানি না। একদিন মধ্যরাতে বাবাকে মা'র পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে দেখেছি : ওরা কেউই টের পায় নি। কি আশ্চর্য! বাবা কাঁদছে আর মা হেসেই যাচ্ছিল অবিশ্রাম। অনেক পর, মা বাবাকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো। সে সময় আমি বাবা মা'র দিকে চাইতে পারছিলাম না। যতক্ষণ ভোরের আলো না ফুটেছে, আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এ রকম পাকা অভিনয় করে গিয়েছি। কিন্তু মনে মনে মাকে ভীষণ হিংসে করেছি। এমন নিটোল যৌবন কি মার বয়স পর্যন্ত আমারও থাকবে ? যদি না থাকে ? আমার জীবনে যে পুরুষটি আসবে, সে কেমন হবে ? সে-ও কি এমন ভঙ্গিতে আমার পা ধরে কাঁদবে, আর আমি হাসবো ? যদি তা না হয় ? যদি আমার সেই পুরুষটি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে দূরে সরিয়ে দেয় ? অজস্র কাঁটা ছড়ানো বিছানায় আমি শুয়ে থাকি, অদৃশ্য রক্তের স্রোত প্রবাহিত হ'তে হ'তে আমাকে এতই দুর্বল আর অসহায় করে তোলে যে, একটি মধুর স্বপ্নের জন্য আমি অপেক্ষা করতে থাকি।

এর কিছুদিনের মধ্যেই অরূপের আগমন। আমাকে কেমন এক নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। অরূপ আমার দূর সম্পর্কের দাদা মৃদুলের বিশেষ বন্ধু। আরও অনেকেই তো আসে এ বাড়িতে, কিন্তু ও যেন কেমন ব্যতিক্রম। আমার খুবই রহস্যময় আপনজন বলে মনে হয় অরূপকে।

অরূপের কথা

মৃদুল খুব সকালে আমার বাড়ি এসে হাজির। গতকালও ওর সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি, ঘুণাক্ষরেও আজ এ'রকম সময়ে আসবে বলেনি, কোন ব্যাপারেই আমার খুব একটা উচ্ছ্বাস নেই, সম্ভবতঃ এটা আমি পারিবারিক সূত্রেই অর্জন করেছি। যজমানি আমাদের আদি জীবিকা। আমার প্রপিতামহ স্বর্গতঃ তারাচরণ তর্কতীর্থ শুনেছি সচ্চরিত্র ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। আমার পিতামহ কালিচরণ ঠিক ততদূর না পৌছুতে পারলেও মোটামুটি বংশ গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আমার বাবা মুরারিমোহন পূর্ব-পুরুষের পদাঙ্ক

অনুসরণ না করে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেই সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। আর মা জয়ন্তী খুবই অসচ্ছল পরিবারের কন্যা। আর্থিক অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও আমার দাদামশাই শিবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও মিতব্যয়ী ও আধুনিকতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেজন্য আমার মা খুব বেশি গোঁড়াপন্থী হয়ে ওঠেনি।

মৃদুলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি ব্যাপার? এত সকালে? রাতে ঘুমোও নি নাকি?

মৃদুল একটু চাপা স্বভাবের। মুখুজ্জে বাড়ির আর দশজনের মত ও নয় যে, তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। ও একেবারেই স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

ও রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসে। বলল, 'ভাবছি একটা বিপ্লব করবো!'

আমি অবাক চোখে চেয়ে থাকি ওর দিকে। এমন নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ও 'বিপ্লব' শব্দটাকে উচ্চারণ করলো যে কী বলবো! বললাম, 'হঠাৎ বিপ্লবের চিন্তা মাথায় এলো যে বড়?'

মৃদুল উত্তর দিল, 'ভাবছ হেঁয়ালী করছি। মোটেই তা নয়। সত্যি একটা বিপ্লবের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

জিজ্ঞেস করি, 'কার বিরুদ্ধে বিপ্লব করবে?'

মৃদুল উত্তর দেয়, 'সময় মত সবই জানতে পারবে। তবে হ্যাঁ, তোমার সাহায্য ছাড়া আমার একার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। অবশ্য জয়ী হলে, তুমি লুজার হবে না। রাজকন্যা আর কিঞ্চিৎ রাজত্বও পেতে পার।'

ওর কথা বলার ঢং-ই এরকম। বললাম, 'এবার কিন্তু সত্যি আমার সব কিছু হেঁয়ালী মনে হচ্ছে। যা বলার, খুলেই বল না?'

মৃদুল উত্তর দেয়, 'তা তো বলবোই। তবে আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমার কথা রাখবে?'

আমিও না হেসে পারি না ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে। বললাম, 'প্রতিজ্ঞা না হয় পরে হবে, তবে কি জান, বর্তমানে রাজকন্যাদেরও দিন বদলের হাওয়া লেগেছে গায়ে। তাছাড়া, গণতন্ত্রে রাজারা সব উধাও হয়েছে। এখন তাই রাজাও নেই, রাজকন্যাও নেই।'

হো হো করে হেসে ফেলল মৃদুল। বলল, 'এ দেশে গণতন্ত্রের পাশাপাশি ধনতন্ত্রেরই রমরমা। রাজারা এখন সব ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়েছে; নয়তো, ভেক ধরে দীন দুঃখীর দরদী হয়েছে।'

আমি প্রসঙ্গ বজায় রেখেই বললাম, 'অনেকে বলে সেটা মন্দের ভাল, আমি বলি, মন্দেরও মন্দ।'

মৃদুল কেমন বিমনা হয়ে যায় সে কথায়। এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না আমার। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'জাহান্নামে যাক সব! আপনি বাঁচলে বাপের নাম এটা কি তুমি অস্বীকার করো?'

'সমর্থনও করি না।'

'তোমাকে নিয়ে হয়েছে আমার জ্বালা। আমার ভয় হয়, তুমি কোনদিনই কিছু করতে পারবে না।'

'তার মানে আমার ভবিষ্যৎ পুরো অন্ধকার, এই বলতে চাইছো তো?'

'সে স্পর্ধা আমার নেই।'

'কেন নেই? তোমরা যাকে ব্লু-ব্লাড বলো সে তো তোমাতেও বহমান।'

'ওহ্, বাবাঃ। ওসব ব্লাড কাউকে ডোনেট করা যায় না, করলেই ফ্যাসাদ।' একটু সময় চুপ করে থেকে ফের মৃদুল বলে, 'তাহ'লে কথা দিচ্ছ তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

আমি উত্তরে বলি, 'আমার পক্ষে সেটা সম্ভব হলে নিশ্চয়ই করবো।'

মৃদুল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সে কথায়। বলে, 'সময় মত বিপ্লবের ব্যাপারটা তোমাকে বলবো, নিশ্চিন্তে থেকো। তোমার মুখের ওইটুকু কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপাততঃ বাগ্‌যুদ্ধ নাই বা হ'ল, যদি কোন কাজ না থাকে তো চলো না আমার সঙ্গে?'

আমি বললাম, 'জানইতো আমি অকাজের মানুষ। চলো যাই'

মৃদুলকে কখনোই পাটভাঙা কাপড়-জামা ছাড়া দেখিনি। ওর পাশাপাশি যেতে আমার সঙ্কোচ হ'বারই কথা। স্বতন্ত্রতায় বিশ্বাসী বলেই বুঝি কে কী ভাববে না ভাববে, তার ধার না ধেরে আমি মৃদুলকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ি।

শরতের আকাশে কেমন একধরনের মাদকতা থাকে। খণ্ড খণ্ড টুকরো মেঘগুলোকে দেখে ভীষণ মজা লাগে। আলো আঁধারির খেলা চলে প্রকৃতির জগতে, আর তা সারা বিশ্বের অণু পরমাণুতে ছড়িয়ে পড়ে বুঝি।

কথা বলতে বলতে মৃদুল আমাকে ওদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলে।

ওদের বাড়িতে ঢোকার মুখেই গণা কাকার মুখোমুখি পড়ে যাই। দেখলেই বোঝা যায় মানুষটার যথার্থ মেরুদণ্ডের অভাব রয়েছে।

গণা কাকা বলল, 'এদিকে এসে তো হে।'

অভ্যবতারও একটা সীমা আছে। আমি ভীষণ বিরক্ত হই মনে মনে। কিন্তু ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ আমার রক্তে আছে বলেই বুঝি গণা কাকার কথাকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। 'কী বলবেন বলুন?'

'তুমিই তো তর্কবাগীশ বংশের ছেলে, তাই না?'

আমি উত্তর দিই, 'আমার বাবা মুরারিমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পিতামহ স্বর্গতঃ তারাচরণ তর্কতীর্থ, তর্কবাগীশ নন'। উত্তরটার মধ্যে হয়তো বা একটু ঝাঁজ ছিল। সেটা গণা কাকার অপছন্দ হ'ল না। বরং মৃদু হেসে বলল, 'যাহা তর্কবাগীশ, তাহাই তর্কতীর্থ। তুমি নাকি এবার কি এক কঠিন পরীক্ষায় পাশ করেছ?'

আমি সহাস্যে উত্তর দিই, 'এরকম পাশ তো প্রতি বছর বহু ছেলেই করে।'

গণা কাকা আকর্ণ বিস্তৃত হেসে বলে, 'যে করে করুক। তুমি করেছ, সেটাই বড় কথা। কেন জান? তুমি হচ্ছো মৃদুলের ফ্রেণ্ড। তাই অবাক হচ্ছি।'

কেন? এতে অবাক হবার কী আছে?

গণা কাকা হাসতে হাসতে বলে, 'এ বাড়ির হাওয়া যার গায়ে লেগেছে তার কিন্তু মা সরস্বতীর সঙ্গে আড়ি হয়ে যায়।'

মৃদুলকে দেখিয়ে বলি, 'এটা কিন্তু মৃদুলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।' বলেই হাসতে থাকি।

গণা কাকা বলে, 'জান তো হে, সঙ্গদোষ বলে একটা কথা আছে। আমার মনে হয় সেটা তোমার জন্যই ওর সম্ভব হয়েছে।'

মৃদুল অমনি ভুল শুধরে দেবার জন্যে বলে, 'তা হ'লে ওটা গুণ বলো, দোষ নয় গণা কাকা।'

গণা কাকা ক্রমশই কেমন নরম হয়ে যেতে থাকে। বলে, 'ভাষাজ্ঞান থাকলে কি আমি দালালি করি মৃদুল?'

আমি বললাম, 'এ কী বলছেন আপনি? বাংলায় দালাল কথাটা শুনতে খারাপ লাগে, ওটা ব্যবহার না করে যদি কেউ বলে ব্রোকার, তা হ'লেই কিন্তু সকলে জাতে উঠে যাবে।'

কেমন ভ্যাবলা চোখে চেয়ে থাকে গণা কাকা। বলে, 'তা বেশ বলেছ। ইংরেজীহলেই মানুষের মুখ চোখের চেহারা কেমন পাল্টে যায়।' একটু সময় চুপ করে থেকে গণা কাকাই প্রস্তাব দেয়, 'ওকে নিয়ে ঘরে আয় না মৃদুল, চুটিয়ে একটু

গপ্পো করি।'

মৃদুলের চোখে চোখ যেতেই দেখি, ওর চোখে গভীর রহস্যের ছাপ। সেটা যে কেন তা সঠিক বুঝতে পারি না।

মৃদুল কথা বাড়ায় না। আমাকে ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে গণা কাকার ঘরে নিয়ে যায়। চটি পায়ে গণা কাকা সিঁড়ি ভেঙে উঠছে, তার শব্দ আমরা শুনতে পাই।

চারু কাকীমা হঠাৎ আমাদের ওভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে বলে, 'কী ব্যাপার মৃদুল ?' বলেই চারু কাকীমা আমাকে আপাদমস্তক দেখতে থাকে। এক পলকেই চারুকাকীমাকে ঘরোয়া পোশাকে অবিশ্বাস্য সুন্দরী বলে মনে হয়। এই প্রথম আমি মুখুজ্জে বাড়ির মৃদুলদের ঘর ছাড়া অন্য আর এক পরিবারে ঢোকার সুযোগ পাই।

মৃদুল বলে, 'কাকীমা, কালই তো ভাল কোম্পানীর চা ঘরে এসেছে। এই আমার বন্ধু অরূপ; তর্কতীর্থ পরিবারের কাঁচকলা আর আতপ চাল খাওয়া ছেলে। দোষের মধ্যে ও বংশগৌরব রক্ষা করতে পারল না, চায়ে ওর ভীষণ আসক্তি।'

সে কথায় চারু কাকীমা অপূর্ব ভঙ্গিতে হাসে।

এরই মাঝে গণা কাকা উপস্থিত হয়ে বলে, 'হ্যাগো একটু জমিয়ে চা করো তো।' আজ মৃদুলের বন্ধু··· আহা কি নাম তোমার তাই জিজ্ঞেস করা হয়নি ত্যাখো, অশিক্ষার এ আর এক নমুনা বুঝলে। বলেই হাসতে থাকে।

নিজের নাম বলে গণা কাকাকে উদ্দেশ্য করে বলি, 'শিক্ষার এ যুগে কোন দামই নেই।'

গণা কাকা বিস্মিত ভঙ্গিতে চেয়ে বলে, 'কি বাজে বকছো।' একদিন ছিল, এ পরিবারেও শিক্ষিত মানুষজন খুঁজে পাওয়া যেত। তারপর কি যে হ'ল, কেবল অন্ধকার, আর অন্ধকার। খেউর আর ছ্যাবলামিই মুখুজ্জেরা আঁকড়ে ধরলো। মা সরস্বতী মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। গণা কাকার কণ্ঠস্বরে কেমন বিষাদের ছায়া নেমে এল।

মৃদুল বলল, 'মিঠুকে দেখছি না, ও কোথায় ?'

চারু কাকীমা বলে, 'ও সারাদিন কি যে করে বুঝি না।' কোথায় যে যায়···

'যাচ্চলে'। হঠাৎ মৃদুলের মুখ থেকে ওই শব্দটা কেমন মুখ ফসকে বেরোয়।

ঠিক এ সময় আমার হঠাৎই চারু কাকীমার দিকে নজর যায়। দেখি উনি অপলকে আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। সঙ্কোচ আর দ্বিধায় চোখ নামিয়ে

নিই আমি।

ঠিক সে সময়ই মিঠুর দেখা পেলাম। তার মানে কি এই দাঁড়ায়, মিঠুকে দেখার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম? কী জানি! ওকে আমি বেশ কয়েকবার টানা বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। বাড়ির এক দঙ্গল মেয়েদের ভিড়ে ওকে কখনো দেখিনি বলতে গেলে। আমার কেন যেন মনে হ'ত আর দশজনের থেকে ও আলাদা। মনে হ'ত, স্বপ্নময় কোন এক দূরতম দ্বীপের অধিবাসী ও। কিন্তু এসব আমি মৃদুলকে কখনই প্রকাশ করিনি।

চারু কাকীমা ওকে দেখে বলল, 'কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?'

মিঠু আমাকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিল। বলল, 'উত্তরের কোণের আলসেতে পায়রা বাচ্চা দিয়েছে, আমি অবাক হয়ে ওদের কাণ্ডকীর্তি দেখছিলাম। আমাকে দেখতে পেয়েই মা পায়রাটা কেমন ভয়ার্ত চোখে চেয়েছিল কি বলবো। ওরাও ঠিক মানুষের মত সব কিছু টের পায়।'

চারু কাকীমা সে কথায় হেসে বাঁচে না। বলে, 'তোর সব কিছুই উদ্ভট।

মৃদুল চারু কাকীমাকে খোঁচা দিয়ে বলে,' চারুকাকীমা তোর সম্পর্কে কী বলেছে, জানিস মিঠু?'

মিঠুর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। বলে, 'তা কী ক'রে জানব মৃদুলদা। তোমরা দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এসে ব'সো না?'

মৃদুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'যাক, বাঁচালি। কাকা আর কাকীমা তো বেমালুম সে সব ভুলেই গিয়েছিল।'

গণা কাকা প্রতিবাদ করে বলল, বাজে বকিস না মৃদুল। তোদের সঙ্গে গপ্পো করবো বলেই না তোদের ডেকে এনেছি।'

আমি মিঠুর চোখে চোখ রেখে বলি, 'মৃদুলের সব কিছুই বাড়াবাড়ি।'

মৃদুল কথা বাড়ায় না। ও আমাকে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। চারু কাকীমার গোল ফ্রেমে বাঁধান ছবিটা থেকে চোখ সরাতে পারি না আমি। আমি অভিভূত হয়ে যাই। মৃদুল বলে, 'কেমন দেখছো চারু কাকীমাকে? আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, ভুল করে চারু কাকীমা স্বর্গ থেকে ঝুপ ক'রে আমাদের এই এঁদো পরিবারে এসে পড়েছেন।'

সে কথায় মিঠুর হাসি রিন রিন করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে।

মৃদুল আমাকে দেখিয়ে বলে, অরূপ হচ্ছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ওকে ধরে আছি খেয়া পার হ'ব ব'লে।'

মিঠু হেসে উত্তর দেয়, খেয়া পেরিয়ে কোথায় যাবে ঠিক করেছ মৃদুলদা ?'

'বেশিদূর যেতে পারব না জানি। জানিস তো, কুয়োর ব্যাঙও মাঝে মাঝে ঘাড় উঁচিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। আমার জীবনে অরূপ সে রকম একটি আকাশ।'

এ'সব শুনে ভীষণ অস্বাস্তিতে পড়ে যাই আমি। বলি, 'কি সব বাজে বকছো মৃদুল। কাঁচকলা আর আতপচাল খাওয়া পরিবারের কাউকে অত বড় ভাবা ঠিক হবে না।' মিঠুর দিকে চেয়ে বলি, 'ও যা ভাবে, তা বিশ্বাস করলেই ফ্যাসাদ।'

গণা কাকা এসব কথা শুনছিলেন কি না জানি না। হঠাৎ চারু কাকীমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কই, চা হ'ল ?'

মৃদুল বলে, তোমার স্পর্ধা তো কম নয় গণা কাকা, স্বর্গের দেবীকে বলছো কিনা চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে ? ছিঃ ছিঃ। যাকে শো-কেসে রাখার কথা তাকে তুমি ঘরগের-স্তালীর কাজে লাগিয়ে নরকের পথ প্রশস্ত করছো।

আমি বলি, 'নরক তুমি বিশ্বাস করো নাকি মৃদুল ?'

'তা একটু আধটু করি ভাই।'

মিঠু চটজলদি জবাব দেয়, 'মুখুজ্জেবাড়ির নরক ছাড়াও আরও একটা নরক আছে নাকি ?'

ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে যায়।

চারু কাকীমা চায়ের কাপ সাজিয়ে সেণ্টার টেবিলের ওপর রেখে বলে, 'তোর বয়সী মেয়ের মুখে এধরনের ভাষা শোভা পায় না মিঠু।'

মিঠু বলে, 'আমি দুঃখিত মা।'

গণা কাকা হো হো করে হাসে। বলে, 'দেখলে তো অরূপ মুখুজ্জেদের ঘরানার একটা দিক।

আমি চুপ করে থাকি। কেননা, সব ব্যাপারে কথা বলাটা বাচালতার পর্যায়ে পড়তে পারে ভেবেই আমি অনেক সময় শ্রোতার ভূমিকা নিই।

চারু কাকীমা বলে, 'জানো অরূপ, এ বাড়িতে যোগ্যতার পরিমাপ হয়...'

মিঠু অমনি বাধা দেয় চারু কাকীমাকে। আমাকে লক্ষ করে বলে, 'আপনার অসুবিধে না হলে, মাঝে মধ্যে এখানে চলে আসবেন।'

মৃদুল বলে, কী অধিকারে আসবে ?'

গণা কাকা সহাস্যে বলে, 'মিঠুর টিউটর হয়ে, তোমার বন্ধু হয়ে, তোমার

কাকীমা'র গল্পের মানুষ হয়ে 'আমার নিঃসঙ্গতা দূর করার সঙ্গী হিসেবে।'

মৃদুল অবাক চোখে গণা কাকাকে দেখছিল! বলল, 'এ সব কি তুমি চিন্তা করে বলেছো, না, মুখে এলো বলে দিলে।'

গণা কাকা বিমর্ষ হয়ে চায়ের কাপে শেষ চুমুক বসিয়ে বলল, 'সব কিছুর উত্তর হয় না মৃদুল।'

মিঠু বেশ কঠিন গলা করে বলল, 'আপনি আসবেন, ব্যাস।

আমার ভেতরে হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। এ'রকম অবস্থা আমার এর আগে আর কখনো হয়নি। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ।

মৃদুল কি বোঝে জানি না। ও আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'ভেবো না অরূপ, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

কারো দিকেই আমি তাকাতে পারি না। ঘর থেকে বেরোতে যাব, ঠিক সে সময় মিঠু বলে 'মানুষের সংসারে নবজাতক এলে শঙ্খধ্বনি হয়, কিন্তু পশু-পাখীদের বেলায় কেউই সেসব নজর করে না। আজ আমার খুব শাঁখ বাজাতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

চারু কাকীমা জিজ্ঞেস করে, 'সে কি ওই মা-পায়রাটার জন্য, না, অরূপের আগমনে?'

মৃদুল বলে, 'ভেবে নাও না কেন, মিঠুর শাঁখ বাজাবার ইচ্ছে ওই দুই কারণেই।'

গণা কাকা হো হো করে হাসে। বলে, 'তোরা যে কি কখন বলিস, কিছুই ধরতে পারি না।'

মিঠু বলে, 'সকলেই সব কিছু বোঝে না; তুমিও না হয় না বুঝলে।'

আমি ধীর পায়ে ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। মৃদুল আমাকে অনুসরণ করে।

রাস্তায় নেমেই মৃদুল বলে, 'রাজকন্যা কেমন লাগল?' রাজত্বটা চোখে পড়ে নি, তবে আছে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, 'এ সব কি বলছো মৃদুল।'

মৃদুল এর প্রতিবাদ করে না। ও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমি পেছন ফিরে দেখিও না। ঋজু ভঙ্গিতে বাড়িমুখো হাঁটতে শুরু করি।

চারু কাকীমার কথা

ডাইরির পাতা ক্রমশই ভরে যাচ্ছে। একে আমি সযত্নে সকলের চোখের থেকে আড়াল করে রাখি। কেন না, ওটা আমার কাছে গোপন কৌটোর মত। অসচ্ছল পরিবারে আমার জন্ম হলেও আমার বাবা বামাচরণ ভট্টাচার্য সাত্ত্বিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। আমার মা হেমলতার যে পরিবারে জন্ম সেখানে সংস্কৃত ও ইংরেজী চর্চা পাশাপাশিই চলতো। বাবার মধ্যে যে সব গোঁড়ামি ছিল, মা'র মধ্যে সে সব একরকম ছিলই না বলতে গেলে। এ নিয়ে বাবা ও মায়ের মধ্যে চাপা অসন্তোষ থাকলেও, তা বহির্জগতে অপ্রকাশ্যই থেকে গেছে। এটা কিন্তু আমি টের পেতাম। কী করে পেতাম, তা বলতে পারব না। আমার দাদা শ্যামাচরণ অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। এর জন্য মা-বাবার কৃতিত্ব কতটুকুন, জানি না। দাদা ছাত্রবৃত্তি নিয়ে স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গোঁ ধরে বসল, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বে বলে। আমার বেশ মনে আছে, দাদার কৃতিত্বের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল আশ্চর্য ভাবে। প্রথম দশ জনের মধ্যে দাদার স্থান ছিল তৃতীয়। ফলে, দাদা যেন দর্শনীয় বস্তুর মতো সকলের চোখে পড়ে গেল। বাবা খুব বিরক্ত হলেন এতে। কিন্তু মা গরিয়সী মহিলার মত আচার আচরণ করতে শুরু করলেন।

হোস্টেলে রেখে পড়াবার সাধ্য বাবার নেই, কিন্তু মা ও বেঁকে বসলো বাবার কথায়। জমি জায়গা যৎ কিঞ্চিৎ যা আছে মা সে সবই বিক্রী করে দিতে বললেন অবলীলায়।

বাবা বললেন, 'সব খুইয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে পারব না। এতে শ্যামার লেখাপড়া হোক আর নাই হোক।'

মা বললেন, 'ওর জন্মের দায়িত্ব যখন আমাদের, তখন ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখাও আমাদের প্রধান কর্তব্য।'

'তা অস্বীকার করি না। কিন্তু কি জান, চারুর ভবিষ্যৎও তো আমাদের দেখা উচিত।'

মা সে কথায় হেসে বলেছিলেন, চারুর যা রূপ, তাতে আমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণই নেই।'

'এটা বাংলা দেশ মনে রেখো। মেয়ে মানেই বোঝা। ধরেই নিলাম না হয় চারুকে দেখে পাত্রপক্ষ যৌতুক কিছুই নিল না, কিন্তু শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে মেয়েকে কি পার করা যায়? আত্মীয় কুটুম্বের কথাটা মাথা থেকে উড়িয়ে দিলে চলবে কি করে?' মা গম্ভীর মুখ করে বলেছিলেন, 'কাদের তুমি আত্মীয় বল? আমার সুখবরে ক'জন অত্মায়কে ছুটে আসতে দেখেছ?'

বাবা সেকথার প্রতিবাদ করতে পারেননি। উপরন্তু সাফাই দেবার ভঙ্গি করে বলেছিলেন, 'সংসারের ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে সকলেই অস্থির। তুমি ওদের মিছিমিছি দোষ দাও হেম।'

বাবাকে যতদূর চিনেছি, তাতে এটা স্পষ্ট হয়েছিল আমার কাছে যে, মনে মনে বিরক্ত হলেই মা-র নাম ধরে বাবা কথা বলেন। এটা মা ও বোধ হয় খুব ভালভাবে জানতেন।

মা বাবার কথাকে সরাসরি উপেক্ষা করে বলেছিলেন, আজ যদি শ্যামা বংশের কুলে কালি দিয়ে এমন কিছু করতো, তখন দেখতে আত্মীয় স্বজনেরা পিঁপড়ের মত ভিড় জমিয়েছে এ বাড়িতে। উনিশ কুড় বছর তোমার সঙ্গে ঘর করছি, তোমার আত্মায় কুটুম্বদের একটুও চিনি নি এ কথা মোটেই ভেবো না। আমিও ওদের আরো জালাব দেখে নিও।

আত্মায় স্বজনদের জ্বালাতে গিয়েই কি মা একের পর এক এমন সব ঘটনা ঘটাতে শুরু করলেন, যাতে বাবার পরিশ্রম গেল বেড়ে এবং সেই সঙ্গে অন্যদের থেকে কেমন ভিন্ন রুচিসম্পন্ন হয়ে যেতে থাকলাম আমরা। একদিন তাই দাদাকে ডেকে মা বললেন 'কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য যা যা করণীয় সব চটপট করে ফেল। এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে যে উদার উন্মুক্ত পৃথিবী আছে তাকে চেনো জানো ও আত্মস্থ করো।' কি সতেজ আর সজীব মার বাচন ভঙ্গি।

দাদাকে বিস্ময়াভিভূত দেখে মা হেসে বলেছিলেন, 'অমন করে কী দেখছিস শ্যামা?'

দাদা খুব সহজ হতে পারছিলেন না কেন যেন। অস্ফুটস্বরে বলেছিলেন 'তুমি কি প্রণামে বিশ্বাসী?'

'যে প্রণম্য তাকে প্রণাম করবে, এতে দোষের কিছু নেই।'

দাদার আড়ষ্টতা মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। মা-কে প্রণাম করে বললেন, 'আমার পেছনে যে বিরাট টাকা খরচ হবে, তা জোগাবে কি করে?'

'সে চিন্তা আপাততঃ আমাদের ওপরেই ছেড়ে দাও না কেন?'

দাদা কথা না বাড়িয়ে সেদিনই কলকাতায় দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে চলে এসেছিল।

সেদিনের পর থেকেই মা হুটহাট ভদ্রেশ্বরের বাড়িতে চলে যেতেন সঙ্গী হিসেবে বাবাকে তো নয়ই, এমন কি আমাকেও কোন দিন নেননি। আমার দাদামশাইয়ের অর্থ কৌলিন্য ছিল না, আবার অভাবীও নন। কখনও তিনি কারো দ্বারস্থ হননি। দাদামশাইকে প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনেরা খুবই শ্রদ্ধা করতেন। মা হাসিমুখেই ভদ্রেশ্বরের বাড়ি থেকে এ বাড়িতে ফিরে আসতেন। দাদা কলেজে ভর্তি হয়ে যাবার পর, মা একদিন বাবাকে বললেন 'চারুর জন্য একজন গানের মাস্টার রেখে দিলে কেমন হয় ?

'ভালতো হয়ই, কিন্তু…

'ও-সব খরচাপাতির কথা তুমি ভেবো না। আমার মনে হয় চারুর গান জানা একান্তই দরকার।'

'যা ভাল বোঝ কর।' বলেই বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন।

একদিন হিমাদ্রিশেখর এল আমাকে গান শেখাতে, ও আমাকে ভাল করে দেখার চেষ্টাও করলো না। রূপ আমার যাই থাক না কেন, সঙ্গীতে আমার কোন সিদ্ধি হবে না সে বোধ আমার ছিলই। তবুও মা-বাবার সামনে হিমাদ্রি আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতো। সে সব সময় আমি মনে মনে হাসতাম। মা'র আর যাই থাক, দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। আমার খামতি কোথায়, সেটা মা একবারও ধরতে পারতেন না। সে জন্য সময়ের অপেক্ষায় আমি প্রস্তুত রইলাম মনে মনে। একদিন সে সুযোগও এসে গেল।

হিমাদ্রিশেখরকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি সত্যি কথা বলতে ভয় পান কেন ?'

হিমাদ্রি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'সত্যি কথাটা কী জানতে পারি ?'

'গানের গলা না জেনেও কেন আপনি মিথ্যে সান্ত্বনা দেন মাকে ?'

হিমাদ্রি ফ্যাসফেসে গলায় উত্তর দিয়েছিল, 'নইলে যে টাকা রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে।'

সে কথায় হাসির ঝড় তুলতে পারতাম আমি। ওকে ভীষণ অসহায় মনে হল মুহূর্তে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তাহ'লে আপনি জানেন, সঙ্গীতে আমার কোন সিদ্ধি নেই।'

'হ্যাঁ জানি।'

'জেনেও আপনি এমন ব্যবহার করেন কেন? অর্থাভাব কী আপনার এতই যে

হিমাদ্রি এমন ভাবে সে কথার সম্মতি জানাল যে, আমি সেই মুহূর্তে কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। কী মনে ক'রে বলেছিলাম, 'আপনাকে যদি এমনি এমনি টাকা দেওয়া হয় তাহ'লে কী করবেন?'

হিমাদ্রি উত্তর দিয়েছিল 'সে হয় না।'

'কেন নয়?'

'সে তো ভিক্ষারই নামান্তর।'

'ভিক্ষাবৃত্তি আর তঞ্চকতার মধ্যে বুঝি আপনি তঞ্চকতাকেই সম্ভ্রমের মনে করেন?'

হিমাদ্রি উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'কাল থেকে আর আসবো না।'

'রোজগারও যে তা হ'লে বন্ধ হয়ে যাবে।'

'যাক্'।

আমি ভেবেছিলাম, কথার কথা বলেছে হিমাদ্রি। কতই বা বয়স হবে ওর। দাদার থেকে বছর দুয়েকের বড় হতে পারে। ওর রুগ্ণ অকম্পিত ভঙ্গি মুহূর্তে ভাল লেগে গেল আমার। ইচ্ছে হ'ল, ওর শীর্ণ ধপধপে হাত জড়িয়ে ধরে বলি—আপনি থেকে যান, আমি আমার কথা তুলে নিচ্ছি। কিন্তু সে সাহস আমার ওই মুহূর্তে হ'লই না।

হিমাদ্রি ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবং ওই প্রথম আমি একজনের জন্য চোখের জল ফেলেছিলাম। ওকে আঘাত দিতে গিয়ে, এমন করে যে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হ'ব তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি।

পরপর দু'দিন যখন এল না হিমাদ্রি, তখন মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে হিমাদ্রি আসছে না কেন, জেনে আয় না?'

মা'র কথায় ভীষণ খুশি হলাম। আমার ভেতরে তোলপাড় শুরু হল। ভীরু, কাপুরুষ, অসচ্ছল আর তঞ্চক জেনেও আমি হিমাদ্রির কাছে যাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। কিন্তু ওর কাছে দাঁড়াবো কোন্ মুখে? যাকে ওই ভাবে জেনেছি, তাকে কি করে বলি, ফিরে চলো। এ যে কাঙালপনা করা হয়ে যাবে। আমার এ ধরনের অস্থিরতার কি সংজ্ঞা দেওয়া যায়? হিমাদ্রির মত মানুষের জন্য কি ব্যাকুলতা প্রকাশ করা আমার মত মেয়ের শোভা পায়? নাকি, ওকে

আঘাত দিতে গিয়ে নিজেই দুর্বল হয়ে গিয়েছি। দুর্বলতাকেই কি প্রেম বলে? নাকি, মনের বিভ্রম? মনকে বুঝ দেওয়া যে কত কঠিন তা এই মুহূর্তে আমি ভীষণ ভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করলাম। সেখানে লজ্জায় দেওয়াল উত্তুঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। মাকে বিনীত ভঙ্গি করে বলেছিলাম, 'দেখি সময় করে একবার যাব ওর কাছে।'

মা ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখেন। আমার মনের গভীরের ছবিটা কি তাহ'লে মা'র কাছে ধরা পড়ে গেল? কেননা, এমন সূক্ষ্ম চোখে মাকে ইতিপূর্বে আর কখনো আমার দিকে তাকাতে দেখিনি।

তবু যথাসম্ভব নিজেকে সংযমের বাঁধুনিতে বেঁধে আমি মা-কে প্রশ্ন করে ছিলাম, 'হিমাদ্রিবাবু যদি না আসতে চান তাহলে?'

'না আসার কি কোন কারণ আছে?'

বুদ্ধিমতী বলেই বুঝি উত্তর দিয়েছিলাম, 'ইচ্ছে না থাকলে কারো কি কারণের অভাব হয়'?

'আগে থেকেই তুই সব বুঝে গেছিস। বুঝেছি, যেতে চাসনা। আমিই সময় করে না হয় ওর কাছে যাব'।

একমুহূর্ত দেরি না করে আমি বলেছিলাম, 'যাব তো বলেছি। তুমি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছো'?

'ব্যস্ত হচ্ছি কি সাধে। ছেলেটি সচ্চরিত্র সদ্বংশজাত কিন্তু অভাবী। কামাই করার মানুষ তো ও নয়। জ্বর-জ্বালায় বিছানা নিয়েছে বোধ হয়'? মা উত্তর দিলেন।

হেসে ফেলেছিলাম আমি। বলেছিলাম, 'এই যাচ্ছি।' বলেই বেরিয়ে এসেছিলাম।

যতই হিমাদ্রির বাড়ির কাছাকাছি হয়েছি, ততই আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, পা দুটোতে কেউ বা পাথরের চাঁই বেঁধে দিয়েছে। এগোতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার।

এখানে বলে রাখা ভাল, স্ত্রী স্বাধীনতার ঢেউ সকলের বাড়িতে না লাগলেও আমাদের বাড়িতে এর পালতোলা নৌকো হু হু করে বয়ে গেছে। সেজন্য আমাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে অধিকাংশই দূরে সরে থাকত, একধরনের চাপা শ্রদ্ধা ও উষ্মা যুগপৎ আমাদের পরিবারকে ঘিরে ছিল, এটা আমরা বেশ টের পেতাম। এসব অঞ্চলে নোংরা আর আবর্জনানিয়ে যত উল্লাস, এমনটা অন্য কোন ব্যাপারে

ছিলই না বলতে গেলে। অথচ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এ জায়গার নাম প্রায় প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমি চিরদিনই একা স্কুলে যাই, ফিরিও একাকী। সঙ্গীসাথীরা আমার সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না, আমিও চাই না। ওদের কাছে দূরের মানুষ হয়ে থাকার গর্ব আমাকে হালকা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত সর্বক্ষণ। হিমাদ্রির বাড়িকে এককথায় ধ্বংসস্তূপ বলা চলে। এর আগেও মা'র সঙ্গে একবার আমি এসেছিলাম। অতীত যে এদের খুব উজ্জ্বল ছিল তা এই ধ্বংসস্তূপই সাক্ষী। কিন্তু কী এক অদৃশ্য ও অমোঘ শক্তি এদের সব উজ্জ্বলতাকে গ্রাস করছিল জানি না। সকলেই বলে, উচ্ছৃঙ্খলতাই এই পরিবারের ধ্বংসের মূল কারণ। কিন্তু হিমাদ্রি বা ওর বাবা মাকে দেখে ওসব কিছুতেই বিশ্বাস করতে মন চায় না।

যাই হোক, দরজার কড়ায় হাত রেখে সামান্য সময়ের মধ্যে নিজেকে দৃঢ় করে তুলি। কড়া নাড়তে এতটুকুও হাত কাঁপে না আমার।

দরজা খুলে আমাকে দেখে হিমাদ্রির মা'র মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। বলেন, 'কী ব্যাপার চারু হঠাৎ অসময়ে' ?

হিমাদ্রির মাকে প্রণাম করে বলি, 'হিমাদ্রিদার খোঁজে এসেছি। বেশ ক'দিন ধরে আমাকে গান শেখাতে যাচ্ছেন না। মা তাই খোঁজ নিতে পাঠিয়ে দিলেন।'

হিমাদ্রির মা গাঢ় করে শ্বাস ফেলে বলেন, 'সবই আমার অদৃষ্ট চারু !'

বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে গেলে যেমন হয়, আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি হল। শুকনো গলায় প্রশ্ন করেছিলাম, 'কেন কী হয়েছে' ?

স্বাভাবিক হলেন হিমাদ্রির মা। বললেন, 'সেদিন তোমাদের বাড়ি থেকে ধুম জ্বর গায়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল। এখনও কমেনি। ডাক্তার সন্দেহ করছে, বুকের দোষ ? কলকাতায় নিয়ে যেতে হতে পারে'।

'আমি কি একবার হিমাদ্রিদার সঙ্গে দেখা করতে পারি ?'

'যাও না, যাও'।

ঘরে ঢুকেই দেখি, মোটা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে হিমাদ্রি শুয়ে আছে। জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে, কিছুই বুঝবার উপায় নেই। তবুও আলতো স্বরে বললাম, 'কেমন আছেন ?' আমার গলা পেয়েই হিমাদ্রি চাদর থেকে মুখ বার করে হেসে ফেলল। বড় ফ্যাকাশে হাসি। ও আমাকে আপাদমস্তক দেখে বলল, 'মন বলছিল তুমি আসবে'।

হেসে ফেললাম সে কথায় আমিও।

ও উঠে বসতে চেষ্টা করল।

আমি বারণ করার ভঙ্গি করে বললাম, 'করছেন কী? যেমন শুয়ে আছেন শুয়ে থাকুন।'

হিমাদ্রি কথা শুনলো না, বলল, 'তুমি ওই টুলটা টেনে বসো। এ রকম জ্বর-জ্বালা কার না হয়'?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ও ফের বলল, 'এভাবে শুয়ে শুয়ে কথা বলাটা অভব্যতা'।

'হোক গে। আপনি শুয়ে শুয়েই কথা বলুন।'

'কী বলবো? কিছুই তো মাথা মুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছি না।' বলেই হাসে হিমাদ্রি। সে হাসি বড় সরল, সহজ। কি মনে করে আমি বললাম, 'আমি আসবো, কী করে জানলেন?'

'টেলিপ্যাথি বোঝ? ওই টেলিপ্যাথি সব আগে থাকতেই জানিয়ে দেয়।' বলেই ফের হাসে হিমাদ্রি।

'আমি কিন্তু টেলিপ্যাথি বুঝি না,' বড় সামান্য মেয়ে আমি।

'সীমার মাঝে অসীম তুমি।' বলেই ও ডান হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। বলে, তোমার একটু স্পর্শ পেলে সব অসুখ বেপাত্তা হয়ে যাবে। আমার হাতে একটু হাত রাখ চারু'। আমি সম্মোহিতের মত ডান হাত বাড়িয়ে ওর হাতে হাত রাখতে গিয়েই কান্নায় ভেঙে পড়ি। হিমাদ্রি আমাকে বাধা দেয় না। ওর খরতপ্ত হাত দিয়ে আমাকে ধরে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ এমনি ভাবে কাটার পর হিমাদ্রি আমার মুখের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বলে, 'কোনদিন তোমার ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না চারু। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। বলতে পার বিশাল বিশ্বের অধীশ্বরও'।

ও যে এমন করে কথা বলতে পারে তা আগে কখনো টের পাই নি। ওকে খুব বড় মাপের মানুষ বলে মনে হ'ল সে সময়। বলেছিলাম,' 'তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠো হিমাদ্রি '।

হিমাদ্রি আর বেশিক্ষণ বসতে পারে না। বালিশে মাথা রেখে তন্নতন্ন করে দেখে যেন আমাকে, ওর মা এসময় গোটাকয়েক নারকোল নাড়ু আর সন্দেশ ডিশে সাজিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, 'সামান্য এটুকু মুখে দাও চারু।'

কেমন যেন বুকের ভেতরটা করে ওঠে। করুণ গলা করে বলি, 'এখন আমি

কিছু খেতে পারবো না।'

হিমাদ্রি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কেন পারবে না?'

আমি কোন উত্তর দিই নি।

হিমাদ্রি বলে, 'সব কিছুকে সহজে যে মেনে নিতে পারে, সেই খাঁটি মানুষ। আমার বিশ্বাস তুমি এর ব্যতিক্রম নও।'

এরপর আর কথা চলে না। নাড়ু আর সন্দেশ সামান্য দাঁতে কেটে হেসেই বলি, 'হ'ল তো! এবার বলুন, কবে যাবেন আমাকে গান শেখাতে?'

হিমাদ্রির মা বললেন, 'নিশ্চয়ই যাবে। শিগ্‌গির শিগ্‌গির সেরে উঠুক তো?'

আমি আর দেরি করি না। ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েই পেছন ফিরে একবার তাকাই। দেখি হিমাদ্রি অপলকে আমারই দিকে চেয়ে আছে। কী মনে করে প্রশ্ন করি, কিছু বলবেন? হ্যাঁ বা না কোন উত্তরই দেয় না হিমাদ্রি। শুধু নজরে পড়ে ওর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। ওর চোখের জলের কী অর্থ তা বোঝার বয়স কি সত্যিই আমার ছিল? আমি জানি না, কিছুই জানি না। শুধু গলার কাছটা আমার কেমন ভারী হয়ে গিয়েছিল সে সময়।

হিমাদ্রির বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আসতেই, আমি কেমন শীতভাব অনুভব করি। ওর চোখে-মুখে কিসের যেন ছায়া দেখতে পেয়েছি। সেটা যে কী তা ভাষা দিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারবো না। শুনেছি, মানুষ সুখ-দুঃখের তীরে দাঁড়িয়ে কোন না কোন সময় চোখের জল ফেলে। ওর চোখের জল একটু আগেই ভেবেছি, পাওয়ার মাঝে যে সুখ তারই অভিব্যক্তি। কিন্তু এখন কেন যেন আমার শীতভাব, হারানোর বেদনায় পেয়ে বসল। নাকি, ও ওর চোখের জল দিয়ে আমাকে অভিষেক করলো। ও যে আমার প্রথম প্রেম। ও আমার মনের গোপন কৌটোয় চিরকাল বেঁচে থাকবে, আর আমি যতদিন বাঁচবো, সেই দুর্লভ সম্পদ বুকে আঁকড়ে ধরে থাকবো। কোনদিন যদি আমি ওকে ভুলে যাই কিংবা ও আমাকে ভুল বোঝে, তবে আমার সব সম্পদ যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কি যে করি, কিছুই ভেবে পাই না। এ সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমার ভেতরের শীতভাবটা ক্রমশই দূরে সরে যেতে থাকে।

বাড়ি এসে দেখি মা গম্ভীর মুখ করে বসে।

আমাকে দেখে জোর করে হাসার চেষ্টা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, হিমাদ্রির কথা। সবিস্তারে ওর সব কিছু বলতেই মা গাঢ় করে শ্বাস ফেললেন।

বাবা বাড়ি নেই, বাবার জন্য ভারি কষ্ট হয়। এ বয়সে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও বাবাকে কোনদিনই বিমর্ষ হতে দেখি নি। খুব হিসেবী ধরনের মানুষ আমার বাবা। জীবনে এই মানুষটা কি কখনও স্বপ্ন দেখেনি? স্বপ্ন না দেখে কি পারে? তা হ'লে একথা আমার মনে এল কেন?

আর তখনই মা বললেন, 'জানিস চারু. শ্যামা আবারও টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। ও তো অবুঝ নয়, আমাদের সংসারের অবস্থাও ও সব জানে। তবু কেন যে, এমন ব্যবহার করছে ইদানীং তা ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। এ সব কথা তোর বাবাকে বলিস না। আমি একদিন কলকাতায় গিয়ে দেখে আসব, ওর এত কিসের চাহিদা।'

কেন জানি না, মা'র মুখ থেকে ওসব শুনে দাদার ওপর ভীষণ অভিমান হতে থাকে সে সময়।

মৃদুলের কথা

খুব ভোরেই বাড়ি মাথায় তুললাম। ভোরের আলো তখনও স্পষ্ট হয় নি। বাথরুমে যাব বলে দরজা খুলে বাইরে পা দিতেই মরা ছুঁচোর ওপর পা পড়তেই গা গুলোতে লাগল। এই ঘিনঘিনে ভাবটা নিতান্তই সাময়িক। বুঝলাম বাড়িরই কারো কীর্তি এটা। একমাত্র চারু কাকীমা ছাড়া বাড়ির আর কারো সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। তাই আমাকে কেউ-ই সুনজরে দেখতো না। তাছাড়া স্বর্গতঃ পশুপতিনাথ মুখুজ্জের নাতি বলে আমার অহংকারও ছিল তীব্র। বাড়ির অন্দর মহলের হাওয়া আমার গায়ে লাগে নি। এ বাড়িটাকে সরাইখানার মত ভাবতে পারলে ভাল হ'ত কিন্তু তা পারছি কই? প্রতিদিনই মনে হয়, এ বাড়ির আগাপাশতলা সংস্কারের প্রয়োজন। একটা স্বপ্ন আমাকে ইদানীং পেয়ে বসেছে জানিনা সে স্বপ্ন সফল হবে কিনা। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই আমি এ বাড়ির ব্যাপারে উদাসীন। এর উন্নতি অবনতিতে আমার কিছুই যায় আসে না। উৎসবে বা দুর্দিনে যতটুকু না হলে নয়. ততটুকুই এ বাড়িতে আমি অংশ নিই, বাড়তি উচ্ছ্বাস আমার একদমই নেই। কিন্তু তাই বলে, আমার ঘরের দোরগোড়ায় মরা ছুঁচো তরকারির খোসা ফেলে যাবে? প্রচণ্ড ক্ষোভ মনের মধ্যে দানা বাঁধলেও আমি এই ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভীষণ এক মজার ব্যাপার পেয়ে গেলাম। মরা ছুঁচোটার লেজে দড়ি বেঁধে সংকীর্তনের সুরে বিকট

চিৎকার করে ছুঁচোর মহিমা কীর্তন করছিলাম। এ সময় বাড়িতে তো মধ্যরাত্রি। আমার বিকট স্বর আর গানের পদগুলো শুনে খুব বিরক্তি নিয়েই সকলেরই ঘুম ভাঙলো। ঘুম চোখে বুড়ো-মেয়ে-ছেলেরা টানা বারান্দার চারপাশে ভিড় জমালো। ওদের যত চোখে পড়তে লাগল, ততই আমি খুশিতে পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। ঘুমন্ত পুরীর ঘুম ভাঙাতে আমার কণ্ঠস্বর যে এত ফলপ্রসূ হবে, তা চাক্ষুষ করে আমার জেদও গেল আরও বেড়ে। দড়ি-বাঁধা ছুঁচোটাকে তুলে ধরে, প্রায় স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বললাম, 'ধন্য ছুঁচো, তোমার দেহাবসানে আমার দুঃখের অবধি নাই, আমি তোমার মহাপ্রয়াণে কাতর। তোমার স্বর্গবাস হউক। প্রাতঃকালে তুমি সকলকে দর্শন দিয়াছ, তোমাকে শত কোটি প্রণাম। যাঁহারা দর্শন করিল, তাঁহারাও পরবর্তী জন্মে যেন তোমারই আকার প্রাপ্ত হয়।' বলেই হো হো শব্দে হেসে উঠি।

সে সময় বাড়ির প্রবীন মধু জেঠা মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'এই সকাল বেলা কি কচ্ছিস রে গু খেকোর বেটা। 'তোমাদের স্বর্গের পথ দেখাচ্ছি জেঠা।' বলেই আবারও হাসি আমি।

মিতু কাকীমা বলল, 'সগগের পথ না ছাই, এ যে ছুঁচোর কেত্তন রে মুখপোড়া'।

আমিও ধীর স্থির ভঙ্গিতে উত্তর দিই, 'এ বাড়িতে ছুঁচোর কেত্তন ছাড়া আর কিছু হয় নাকি?'

বেশ কিছু বিরুদ্ধবাদী জমায়েত হ'ল আমার বিরুদ্ধে। সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, 'তোকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়াই হবে উচিত শাস্তি।'

সে কথা শুনে আমার মাথায় রাগের আগুন লক্‌লক্ করে উঠল। চিৎকার করে উঠলাম, 'কার বুকের পাটা আছে আমাকে বাড়ি থেকে দূর করে দেয় দেখি। সাহস থাকে মুখোমুখি দাঁড়া। বজ্জাতি আর অপকর্মে যাদের মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত ছেয়ে আছে, তারা করছে আমার বিচার? আমাকে শাসানো! পশুপতি মুখুজ্জের নাতি আমি। সব হারামজাদার মুখে পেচ্ছাব করে দেবো। এক বাপের ব্যাটা যদি থাকে তো আয় আমার সামনে। সাহস থাকে তো বল, এ অপকর্ম তার। বল, কে আমার ঘরের সামনে আস্তাকুড় করে রেখেছিস। কতগুলো মেরুদণ্ডহীন অপদার্থ প্রাণী, নিজেরা যা পারিস কর, আমাকে ঘাঁটাতে যাস না। আমি কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। বেজন্মা যদি কেউ না থাকে তো বলছিস না কেন, এ বজ্জাতি সে করছে। কোনো শালা যদি আমার পেছনে ট্যাঁ ফোঁ করিস তো, আমিও বলে রাখছি, তোদের

সকলের কীর্তি আমি ছাপিয়ে পাড়ায় বিলি করবো। 'বলেই যা কখনো করিনি, তাই করে বসলাম রাগের মাথায় সেদিন। বয়স্কদের সামনে ফস্ করে সিগারেট ধরিয়ে দড়ি সমেত ছুঁচোটাকে বন্ বন্ করে ঘোরাতে লাগলাম পাগলের মত।

মুহূর্তেই সব ফরসা হয়ে গেল। যে যার ঘরে সেঁধিয়ে গেল। তা দেখে আমি হেসে বাঁচি না। ওদের ওই অপদার্থ ভূমিকা দেখে আমি এত অবাক হলাম যে কী বলবো। সকলেই যাতে শুনতে পায়, তেমনি গলা করে বলে উঠলাম, কোথায় গেল সব বীরপুঙ্গবেরা। লাথি মারবি বলেছিলি না, আয় লাথি মেরে যা। এসেই দেখ, মালাইচাকি, কেমন করে প্যাকাটির মত ভেঙে দি। চিরজন্ম ওল্টানো ব্যাঙের মত পড়ে থাকবি রে, হারামজাদা, শুয়োরের দল।'

ঠিক এ সময় চারু কাকীমাকে বারান্দায় একাকা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। বলি, 'কিছু বলবে নাকি চারু কাকীমা ?'

'তুমি ঘরে যাও মৃদুল। এ সব ভাষা তোমার মুখে শোভা পায় না।'

মুহূর্তেই চেতনায় ফিরে আসি আমি। কথা না বাড়িয়ে ছুঁচোটাকে টানতে টানতে বাড়ির বাইরে ফেলে দিয়ে চারু কাকীমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলি, 'আমি দুঃখিত চারু কাকীমা।' উনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘরের ভেতরে চলে যান। আমার অতীতের অনেক কিছুই মনে পড়তে থাকে।

বাবার কাছ থেকে জেনেছিলাম, আমার ঠাকুর্দা বিলেতে ডাক্তারী পড়তে যাওয়ার পরই, আমার প্রপিতামহ নরেশচন্দ্রকে এবাড়ি ছাড়া করেছিল এ বাড়িরই সে আমলের হোমড়া চোমারারা। নরেশচন্দ্র নির্বিরোধী মানুষ ছিলেন, ওই সব বদ-বজ্জাতদের সঙ্গে ইচ্ছে করলে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি। কেননা উনি বিশ্বাস করতেন জীবনের ছন্দ হারিয়ে কায়ক্লেশে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার কোন মানেই হয় না। তাই উনি সপরিবারে উত্তরপাড়ায় গঙ্গার তীরে বাসা ভাড়া করেছিলেন এবং এ বাড়ির যাবতায় খবর ঠাকুর্দাকে দিতেন। কিন্তু কখনই নরেশচন্দ্র মুষড়ে পড়েন নি বা ঠাকুর্দাকে বিলেত থেকে চলে আসার জন্যও লেখেন নি। বরং যথার্থ মানুষ হয়ে দেশে ফেরার কথাই সব চিঠিতে লিখতেন।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী এমন দোষ ছিল আমাদের যে এ বাড়ির লোক আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতো ?' বাবা সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন, হিংসে। বড় হ' তখন সব বুঝতে পারবি, হিংসার আগুন যে কী সর্বনাশ করতে পারে তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।'

ঘরে এসেই বাবার সব কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু আমি ভেবে পাইনা, সে যুগ আর এ যুগ তো এক নয়. তবু কেন ওরা আমাকে এত জ্বালাবে?

বাড়ির ভেতরে কী নিয়ে যেন হাসি হুলোড় হচ্ছে শুনতে পাই। অন্যদিন হলে হয়তো, বারান্দায় দাঁড়িয়ে এর কারণ অনুসন্ধান করতাম, কিন্তু সে ইচ্ছা একদমই আমার হ'ল না। আমি ঘরে বসে ভাবছিলাম, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত হৈ চৈ না করলেই পারতাম। কোন লাভই তো হল না, মাঝখান থেকে চারু কাকীমা আমার সম্পর্কে কী ভাবলেন কে জানে।

এমন সময় চারু কাকীমার গলা শুন ত পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, এক দঙ্গল ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে চারু কাকীমা বলে যাচ্ছেন, 'ছিঃ ছিঃ এ কী করছো তোমরা, মানুষটার কথা শোনই না? নিরীহ একজনকে নিয়ে এমনটা করা উচিত নয়। মিছিমিছি বেচারাকে হেনস্থা করছো?' ও মৃদুলের কাছে এসেছে এই ওর অপরাধ?'

শুনে আমি তো অবাক। চারু কাকীমা বলেন কী? আমার কাছে এসেছে ওই লোকটা! হাড় জিরজিরে চেহারা, কাশফুলের মত মাথার চুল। অনেক দিনের না কামানো মুখ, হেঁটো কাপড় পরা, মানুষটাকে কিছুতেই বারান্দা থেকে চিনতে পারলাম না, তাই নিচে নেমে এলাম। আমাকে দেখে ওদের সকলের হাসি গেল থেমে।

বিজনদা বলল, 'যা সব পালা, দেখছিস না. পরিত্রাতা এসে পড়েছে?'

আমি সামান্য হাসলাম সে কথায়, উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। লোকটার দিকে এগিয়ে এসে বললাম, 'কাকে খুঁজছেন?'

'সোমনাথবাবুর ছেলে তুফানকে?'

'আমিই তুফান। কিন্তু আপনি কে তা তো বুঝতে পারছি না?'

অপরিচ্ছন্ন চেহারার মানুষটার মুখ মুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চারু কাকীমার দিকে হাত জোড় করে বললেন,'আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, পেন্নাম নেন।' এবার আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থেকে বললেন, 'আমিও তো ছাই তোমাকে চিনতে পারছি না। উঃ, বয়সের কী জ্বালা!'

চারু কাকীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ওকে কতটুকু বয়সে দেখেছিলেন?'

কপালে ভাঁজ ফেলে লোকটা উত্তর দিল 'ওই বালিগঞ্জের বাড়িতে। চার বছর বয়স ছিল তুফানের তখন। সমু ওকে তুফান বলে ডাকত। কী ঝড় বাদলার দিন, পষ্ট মনে আছে, সমু অস্থির, বউমা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে! আমি

পাশের বাড়ির অনাদিবাবুর বাড়ি গে' সব বললাম। অনাদিবাবু মানুষটা বড় ভাল ছিল। একটুও দেরী না করে অনাদিবাবু তার বউরে নিয়ে গাড়ি করে সমু আর বউমাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল। 'আমার কী চিন্তা মা।' বলেই ফুঁপিয়ে কাঁদলো লোকটা।

চারু কাকীমা বললেন, 'আপনার নাম কী' ?

'নীলমণি মণ্ডল। বাড়ি সাগরদ্বীপে'। বুড়ো হয়েছি দেখে সমু টাকা পয়সা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিল।'

বলেছিল, 'নীলুদা অনেক তো এ বাড়ির জন্য করলে। বাকী জীবনটা নিজের লোককে নিয়ে সুখে-দুঃখে কাটাও গে। চার বিঘে জমি কিনেছিলাম ও টাকা দিয়ে। তা থেকে এখন বারো বিঘের মালিক হয়েছি। বড় ছেলে হারাণ মরে গেল। আমি পড়ে আছি। ছোট ছেলে নারাণও বুড়ো হয়ে গেছে। চোখে দেখে না। আর আমি পষ্ট সব দেখি। কী কপাল মা গো। আমি অন্ধ হলে দোষ ছিল কী ? অনেক তো দেখেছি, আর সাধ নাই। হারাণ-নারাণের ছেলেরা জোয়ান হয়ে ঘর সংসার সামলাচ্ছে। তাই ফাঁক বুঝে তুফানকে দেখতে চলে এলাম'। বলেই আমার মুখে শিরা বের করা হাত ছুঁইয়ে আদর করতে লাগল। 'সোনা, তুই এত বড় হয়েছিস ?'

বাবার কাছ থেকে নীলমণির অনেক কথা শুনেছি। এক ধরনের অপরাধ বোধ আমাকে পেয়ে বসে।

চারু কাকীমা বলেন, 'দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে মৃদুল। ভেতরে নিয়ে গিয়ে মানুষটাকে জিরোতে দে' বলেই চারু কাকীমা চলে গেলেন।

আমি নীলমণি জেঠার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে চারু কাকীমাকে সহাস্যে বললাম, 'সত্যিই তুমি লক্ষ্মী চারু কাকীমা।'

বাড়ির লোকজন আমাকে অবাক চোখে দেখছিল। পরম মমতাভরে মানুষটাকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে নিজের ঘরে এসে বললাম, 'বসুন নীলমণি জেঠা।'

'ত্যাখ, ও সব আপনি আজ্ঞে অন্য জায়গায় করিস। আমার ওসব কেমন পর পর মনে হয়।'

আমি হেসে বলি, 'আচ্ছা আচ্ছা, এবার তুমি এই চেয়ারটায় বসো তো ?'

নীলমণি হাত জোড় করে বলে, 'মনিব থাকবে দাঁড়ায়ে, আর আমি বসবো, তা হয় না।'

'খুব হয়। তাছাড়া তুমি আমার গুরুজন। আমি কী করে মনিব হই তোমার?'

'ও বাবা! সমুও তো এমন ধারা কথা কইতো। আর সে সব শুনে আমি লজ্জা পেতাম বলে, বউমা কী হাসাই না হাসতো।' কথা শেষ করে ফোকলা মুখে নীলমণি জেঠা এমন হাসল যা দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। জোর করে ওঁকে চেয়ারে বসিয়ে আমি মুখোমুখি আর একটা চেয়ার টেনে এনে বসলাম, 'হলো তো! এবার তো তোমার লজ্জার কিছু নেই জেঠা।'

নীলমণি জেঠা বলল, 'আর একটু গা ঘেঁষে বোস তুফান। কী সুন্দর গায়ের রং, এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ছিল তোর। বউমা ঝুঁটি বেঁধে কাজল পরিয়ে তোকে যখন বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতে বলতো, তো কী বলবো তুফান, পথের লোকজন তোকে অবাক হয়ে দেখতো। আর আমি বাড়ি এসে শুকনো লঙ্কা পোড়াতাম, তার গন্ধে সমু আর বউমা কেশে বাঁচতো না। বউমা বলতো নীলমণিদা, তুমি আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে ছাড়লে। এ সবের কী মানে হয় বলতে পার?'

আমি বলতাম, 'মানে হয় বউমা, মানে হয়। তুমি আর ওকে এবার থেকে ঘর থেকে বের কো'র না বউমা। সবাই তো সমান নয়, কুদিষ্টি দেয়। তাই লঙ্কা পোড়াচ্ছি। ওই যে খকর খকর কাঁদছো, তাতেই প্রমাণ হচ্ছে, 'সোনার দিকে কেউ কুদিষ্টি দিয়েছিল।' এই পর্যন্ত বলেই নীলমণি একটু দম নেয়। বলে, 'মানুষের মধ্যে কিছু রাক্ষস আছে। ওরা ভালকে সহ্য করতে পারে না।'

আমি বলি, 'দূর ওসব একদম বাজে কথা।'

'না, সোনা, না, সব বাজে কথা নয়। অনেক দেখে তবে এ সব শিখেছি আমি।'

আমি বলি, 'বেশ বেশ! তা না হয় হ'ল, কিন্তু এভাবে তো তোমাকে আমি থাকতে দেবো না। মুখ হাত ধোও, দাড়ি কামাও, পরিষ্কার জামা কাপড় পরো। তারপর জলখাবার খেয়ে দু'জনাতে প্রাণ খুলে গল্প করবো।'

নীলমণি জেঠা বলে, 'তা তো করবোই। তার আগে বল, 'এত বছর আসি নি বলে রাগ করিস নি?'

আমি তো অবাক। ভাবি, অপরাধ তো আমারই হবার কথা। বাবা তো ওঁর খোঁজ-খবর নিতে বলেছিলেন। কিন্তু যাচ্ছি-যাবো করেও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সম্ভবত এরও একটা কারণ ছিল। তা হচ্ছে, যে মানুষটার কথা

আমার বিন্দুমাত্র মনে নেই, তার কাছে হঠাৎ যদি চলে যাই তো, ঘোর সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে পারে। রাজনীতির নামে যে নরমেধ যজ্ঞ চলছে ইদানীং, তাও আমার যাওয়ার পথের প্রতিবন্ধক হয়েছিল। অচেনা অজানা কাউকে দেখলেই সন্দেহ করে। কত নিরীহ মানুষ যে এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসেব নেই। তাহলে কী ভয় আমাকে নীলমণি জেঠার কাছে যেতে দেয় নি? নিজের ওপরে এই প্রথম আমার কেমন একধরনের বিতৃষ্ণা জন্মাল। মুখে কিছুই না বলে কাজের লোকটিকে আড়ালে গিয়ে ভাল মতন ওঁকে আপ্যায়ণ করার কথা বলে ফিরে এসে দেখি চেয়ারে হেলান দিয়ে নীলমণি জেঠা বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন।

মানুষটাকে এবার আপাদমস্তক ভাল করে দেখি। এত মায়ামমতা মানুষটা এই বুকের ভেতরে জমিয়ে রেখেছে কী করে? আমরা যারা এ যুগের, তারা কি কখনো এরকম সহজ হতে পারবো? এর উত্তর আমার জানা নেই।

আধঘণ্টার মত সময় মানুষটার দিকে অপলকে চেয়েছিলাম। ভাবছিলাম এই মানুষটাই আমার বাবাকে, আমাকে কতই না আদর করেছে ওর ওই চর্মসার শিরা বের করা হাত দিয়ে।

বাবার কাছ থেকে যদিও অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু কিভাবে যে মানুষটা বাড়ির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে গিয়েছিল সে সব জিজ্ঞেস করিনি কোনদিন।

এবার নীলমণি জেঠাকে ঘুম থেকে তুলে বললাম, 'তুমি বড় ক্লান্ত জেঠা, এবার কিছু মুখে দিয়ে ঘুমোও। কোন সঙ্কোচ ক'রো না।'

সে কথায় আবারও হাসল নীলমণি জেঠা। বলল, 'ওরে ব্যাটা তোর কাছে আবার সঙ্কোচ কিরে! সমুকেই কতদিন বকেছি. আর তুই তো তুই।'

আমি হেসে ফেলি সে কথায়। ওকে ধরে বলি, 'আর নয়. অনেক হয়েছে। এবার চলো, মুখ হাত ধোবে এসো।' জামা কাপড় বের করে বলি, 'ওসব ছেড়ে এগুলো পরবে এসো।'

'এ বাবা! এ যে একেবারে ভদ্দরলোকের পোশাক রে তুফান। বাড়ি গেলে বাড়ির লোক আমাকে চিনতেই পারবে না।' বলেই হাসে নীলমণি জেঠা।

'হাসে, হাসুক। মানুষ তো অনেক দেখেছ! এ বাড়ির লোকও তো তোমাকে দেখে খুব হাসছিল। তখন তোমার কষ্ট হয়নি জেঠা?' আমি প্রশ্ন করি।

নীলমণি জেঠা সহজ গলায় উত্তর দেয়,' কষ্ট আবার কি! ওসব না হলে কি

আমি আমার কেষ্ট ঠাকুরকে পেতাম ?' 'বলেই কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কোথায় কলঘর বলে দে।' 'এসো।' ওকে সাবধানে বাথরুমে নিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর গায়ের জামা খুলে ফেলতে থাকি। ঘামে জবজবে হয়ে ভিজে গিয়েছিল জামা, গেঞ্জি। সেগুলো খুলে নিজেই ওকে পরিষ্কার করে দিই। নীলমণি জেঠা আমাকে বাধা দেয় না। এ যেন ওর প্রাপ্য। এ রকমেরই মনোভাব প্রকাশ পায় ওর আচরণে। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে ওকে আবার ভেতরে নিয়ে আসি। কাজের লোক লুচি, মিষ্টির প্লেট সাজিয়ে দেয়।

বললাম, 'খাও জেঠা।'

নীলমণি জেঠা খেতে খেতে বলে, 'বেঁচে থাকার মাঝে সুখও যেমন, দুঃখও তেমনি। যদি মরে যেতাম তো, আজকের এই সুখ কি কোনদিন পেতাম রে তুফান ?'

আমার বুকের ভেতরে খালি ঢেউ আর ঢেউ আছড়ে পড়তে থাকে। সত্যিই তো জীবনে যে এত সুখ তা কি এর আগে এমন করে আর কখনও পেয়েছি!

ডিশের সব খাবার খেয়ে ঢক ঢক করে জল খেল নীলমণি জেঠা। একটা ঢেঁকুর তুলে বলে, 'এবার কাজের কথা বলি শোন!'

মানুষটা শুধু চোখের দেখাই দেখতে আসেনি, কাজ নিয়েও এসেছে তা হলে! কেমন ধাঁধায় পড়ে যাই আমি।

নীলমণি জেঠা বলে, 'সমু বলতো···বলেই কেমন চুপ করে গেল।

'কী হলো ?'

অনেক দূর অতীতে চলে যায় নীলমণি। বলে, 'মানুষের দুঃখ কোথায় জান বাবা ?'

'না জানিনা তো ?'

ফোকলা মুখে হেসে বলে, 'কি করে জানবি ? আসলে দুঃখ হচ্ছে স্মৃতি। সব কিছু ভুলে যেতে পারলে মানুষ খুব সুখে থাকতো। তোদের কথা যদি ভুলে যেতে পারতাম তো ক্ষতি ছিল কি ? কিচ্ছু না বলেই গাঢ় শ্বাস ফেলে বলে, তা যখন হয় নি, তখন দুঃখ করে লাভ কি ? সমু বলতো, ওর মৃত্যুর পরও যদি আমি বেঁচে থাকি তো তুফানকে সংসারী করার সব দায়িত্ব আমার। হারাণের বড় ছেলে তোর থেকে বছর তিনের বড়। ও বউ বাচ্চা নিয়ে সুখেই আছে। নারাণের ছেলেরও বিয়ের তোড়জোড় চলছে। আর তাই ধাঁ করে সমুর কথা মনে পড়ে গেল। ওকে কথা দিয়েছিলাম, 'ও সব ভাবিস না সমু। যদি বেঁচে থাকি তো

তুফানের একটা সুখের সংসার গড়ে দেবোই। তাই তো তোর কাছে চলে এসেছি।'

নীলমণি জেঠার কথা শুনে আমি হো হো করে হাসি। বলি, 'কু-মতলবে তুমিও তো কম যাও না জেঠা। ও সব আমার কপালে নেই।'

'হ্যাঁ, সব জেনে বসে আছিস! বড্ড বোদ্দা হয়েছিস দেখছি। এ বাড়ির কেউ-ই তোর চিন্তা করবে না; সব ক'টা হাড়বজ্জাত। তোর বাবার কাছে সব শুনেছি। তা আমিও সেয়ানা কম না। ওই তোদের চোরবাগানের বাড়িতে আমি আজই যাব। বুড়ো-থুরো যারা আছে, তারা হয় তো আমাকে চিনতে পারবে। ওরা সজ্জন। আমার কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না দেখিস। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ বাড়ি সম্পর্কে কী জান তুমি?'

নীলমণি জেঠা বলে, 'সব কথা বলেনি সমু। তবে ভাবে ভঙ্গিতে জানিয়েছিল, তোর ঠাকুর্দা বালিগঞ্জে বাড়ি করে তোদের নিয়ে চলে আসার পরই এ বাড়ির অনেকেই তোদের সুনজরে দেখতে পারত না। তবে তোর ঠাকুর্দা, পুজো-পার্বণে তোদের সকলকে নিয়ে যেতেন। আত্মীয়-স্বজনের কথা মাথা থেকে উড়িয়ে দিতে পারেনান।'

তারপর? আমি উৎকণ্ঠিত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আর কি কি জান বলো না।' নীলমণি জেঠা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'তোর আগে আরও দুজনের জন্ম হয়েছিল। ওরা বেশি দিন বাঁচে নি। টাকা আর খ্যাতি থাকলেই তো মানুষ সুখী হয় না। সমু আর বউ-মার মনে কোন সুখ ছিল না। বাড়িতে থাকলেও কেমন যেন ছাড়াছাড়া ভাব। এ সব আমার নজর এড়ায় নি। সমুকে ডেকে বলেছিলাম, 'তুই পুরুষমানুষ। কাজে কম্মে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তুই সময় কাটাতে পারিস, কিন্তু বউমা কি নিয়ে সময় কাটাবে বল? তুই যদি ওর পাশে না থাকিস তো বউমার বাঁচাই যে নিষ্ফল হয়ে যাবে।' তোর বাবা সেদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিল। বলেছিল, 'কারো তো কোন ক্ষতি করি নি নীলমণিদা, তাহ'লে আমার কপালে এত দুঃখ কেন?'

আমি কি লেখাপড়া জানা লোক যে বুঝিয়ে বলবো। তবু বলেছিলাম, 'তুই শক্ত না হলে, বউ-মার তো কিছুই থাকবে না। যা, জোর করে বউমাকে নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়া। মানুষ সব ভুলে যায়। দেখবি, তোরাও একদিন ওই শোক ভুলে যাবি। তার কিছুদিন পরই তুই এসে ওদের কোল ভরিয়ে দিলি। ওদের জীবনে হাসি ফিরে এল।' বলেই কেন জানি না, নীলমণি

জেঠা চোখের জল মুছলো। 'আমি বললাম, আমি স্বাধীন ভারতে জন্মেছি।'

নীলমণি জেঠা বলল, মনে আছে বাহান্ন সালে। আর তোর ঠাকুর্দা মারা গিয়েছিলেন স্বাধীনতার পরের দিন।

'তার মানে ষোলই আগস্ট?'

'অতশত মনে নেই। লোকে লোকে ছেয়ে গিয়েছিল ও-বাড়ি। সব খবরের কাগজে তোর ঠাকুর্দার ছবি বেরিয়েছিল। খুব ধুমধাম করে শ্রাদ্ধশান্তি করেছিল সমু। যাক গে ও সব কথা। তুই কি এরকম ধম্মের ষাঁড় হয়ে থাকবি নাকি?'

আমি সহাস্য বলেছিলাম, 'না, না, সকলে ঘর সংসার করে, আমিও করবো।'

নীলমণি জেঠা আমার মাথায় হাত রাখল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'সেদিন পর্যন্ত আমি যেন বেঁচে থাকি তুফান।'

আমিও উত্তরে বলেছি, 'মরেই ভ্যাখ না একবার। তোমাকে স্বর্গ থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে আনব না।'

সেকথায় নীলমণি জেঠা দুলে দুলে হাসে। পরে বলে, 'যদি বলিসতো, ও বাড়িতে আজই যাই, কথাবার্তা শুরু করে দিই।'

মানুষটা কষ্ট পাক এ আমি চাই না। বলি, 'নিশ্চয়ই যাবে। তোমার পছন্দই আমার পছন্দ জেঠা। তবে হ্যাঁ, ধনী পরিবারের মেয়ে না হলেও চলবে। আমি চাই আমার মা'র মত একজনকে।'

অনেক অনেক কথায় সময় কাটতে থাকে।

খাওয়াদাওয়া সেরে নীলমণি জেঠাকে পাশে নিয়ে শুই আমি। সারাক্ষণ ও আমার পিঠে হাত বুলোয়। আমি বাধা দিই না। আমার চোখে ঘুম আসে না। কিন্তু টের পাই জেঠার হাত আমার পিঠের ওপর নিথর হয়ে আছে। বুঝি, নীলমণি জেঠা ঘুমে আচ্ছন্ন। বড় মায়া ওর সব আচার আচরণে। শূন্যতার যে খাদ আমার বুকে জমে উঠেছিল, তা আকস্মিক নীলমণি জেঠার আবির্ভাবে পূর্ণ হয়ে গেল যেন।

অথচ, সকালটা আমার কি বিশ্রী ভাবেই না কেটেছে। বিকেল হতে তখনও বেশ বাকী, নীলমণি জেঠা ঘুম থেকে জেগেই হতাশ গলা করে বলল, 'আই বাপ, কত বেলা হয়ে গেল। চোরবাগানে যাব কখন?'

'আজ না গেলেই নয়?'

'শুভ কাজে দেরী চলে না বাবা। সমুর শেষ কথাটা তো আমাকে রাখতেই হবে। নইলে, নেমকহারাম হয়ে যাব যে। মরে গেলে কথা ছিলনা, বেঁচে যখন আছি, বুকের মাঝে পাখির ঝাপটানি শুনতে পাই যে সব্বোক্ষণ। তা বাবা, আমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবি তো চোরবাগানে?'

'কেন পারবো না। তাছাড়া, তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারি নাকি? চা খেয়ে না হয় বেরোনো যাবে।' আমি উত্তর দিই।

নীলমণি জেঠা ভারীসুন্দর হেসে বলে, 'বালিগঞ্জ ছাড়ার পর ও পাট তুলে দিয়েছি। সব্বোক্ষণ খালি ভয় হ'তো, ছেলেরা যদি আমাকে সমাদর না করে। আপনজনের কাছ থেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহ্য করা কঠিন, তাই না বাবা? কিন্তু দয়াময় আছেন, তিনি সব দেখেন। ছেলেরা বড় বাধ্য হয়েছে আমার, নাতিরাও। আর তুই তো সোনার টুকরো। তুই চা খেয়ে নে, আমি ও বাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরী হই।'

নীলমণি জেঠাকে নিয়ে বেরোতে যাব ঠিক সেই সময় পুলিনকাকা ঘণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে হাজির।

'কি খবর পুলিন কাকা?' 'ঘণ্টুর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলেছিলাম, 'এটাকে আবার সঙ্গে করে এনেছ কেন?'

পুলিন কাকা বলেন, 'কিছু মনে করো না তুফান। সম্পর্কে ঘণ্টুও তোমার কাকা হয়। এ ভাবে কথা না বলাই ভাল।'

আমি হেসে ফেলি। বলি, 'আরে ব্বাস্, আমার ডাক নামটা যে কেউ মনে রাখবে তা ভেবেই পাচ্ছি না।'

পুলিন কাকা বলেন, 'সকলকেই খারাপ ভাবা ঠিক কী? জান তো, সোমনাথ-দা আমাকে পছন্দই করতেন।'

'জানি, তার কারণ আপনি আর দশজনের মত নন বলে। মা সরস্বতীর কৃপা আপনার কপালে যা হোক জুটেছে এবং সে কারণেই বুঝি আপনি একটু স্বতন্ত্র। একটু সময় নিয়ে বলি, 'ম্যান ইজ নোন বাই হিজ কম্পেনিয়ান'। 'আপনার এই অপদার্থটার সঙ্গে মেলামেশা করা আমি ভাল চোখে দেখি না। সম্পর্কের খাতিরে কাকা হলেই কি সকলকে শ্রদ্ধা করা যায়? যায় না। যাক্‌গে, কি বলবেন বলুন?'

পুলিন কাকা আর বেশি কথা বাড়ান না। বলেন, 'সকালের ঘটনার জন্য আজ সকলে আমরা আলোচনায় বসবো ভাবছি। তোমাকে তাই উপস্থিত

থাকতে বলা হচ্ছে।'

আমি যেন পরিষ্কার বুঝতে পারি, আমার বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকানোর ষড়যন্ত্র চলছে। যাই হোক, পুলিন কাকাকে জিজ্ঞেস করি, 'আমি উপস্থিত থাকলে অনেকেই ঝামেলায় পড়বে, তার চেয়ে আমি নাই বা গেলাম। আর যদি বাধ্য করেন তো যাব নিশ্চয়ই।'

পুলিন কাকাকে কেমন হতাশ দেখায়। বলেন, 'চোরবাগানের ওরা তো সবসময় সুযোগ খুঁজছে। ওরা যাতে এ বিষয়ে লম্ফঝম্ফ করতে না পারে তারই জন্য···'

আমি পুলিন কাকাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলি, 'একই গাছের ডাল ওরা আমরা। এই যে দীর্ঘদিন ধরে অহেতুক মন কষাকষি চলছে, তা কি সমর্থন যোগ্য। কে দোষী, কে নির্দোষ সে বিচারের ভার আমার নেই, তবু বলি কি, একটা দাঁত নড়লে যেমন আর একটাও দুর্বল হয়ে যায়, ঠিক তেমনি আমরা দুর্বল হলে ওরাও দুর্বল হবে, ওরা দুর্বল হলে আমরাও দুর্বল হব। আপনি তো জানেন, আমার ঠাকুর্দা ও বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ভালই রাখতেন। বাবার প্রিয়জনদের মধ্যে সর্বেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ছিলেন। রত্নেশ্বর কাকা এখনও জীবিত। ও বাড়ির সঙ্গে আমিও সম্পর্ক রাখি। এখানে যেমন অষ্টপ্রহর নোংরা আবর্জনার গন্ধে ম-ম করে, ওখানে তা কিন্তু নেইই বলতে গেলে। ওরা নম্র, ভদ্র, বিনয়ী, আর এখানের! যাক গে, আমি যাব কিন্তু আগেই বলে রাখছি অপ্রীতিকর কিছু যদি ঘটাবার চেষ্টা হয়, তো আমিও সাধ্যমত সকলের স্বরূপ প্রকাশ করবো। তখন কিন্তু আমাকে দুষবেন না।'

ঘণ্টু কাকা হ্যা হ্যা করে কী যেন বলতে যায়। ওকে এক ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলি, 'ওসব হ্যা-হ্যাপনা অন্য কোথাও কোরো এখানে নয়।'

কিন্তু ও এতই নির্লজ্জ যে কী বলবো। ও ঠিক আগের মত ভঙ্গি করেই বলে, 'কেন যে মিছিমিছি আমার ওপরে তোর এত রাগ বুঝি না। সম্পর্কে কাকা হলেও তুই আমার ফ্রেণ্ড।' বলেই অশ্লীল ভঙ্গিতে চোখ নাচায়।

সকালের আগুনটা নিভেছিল, ফের ঘণ্টুর আচরণে নিজের সংযম হারিয়ে ফেলি। বাঁ হাত দিয়ে ওর পাঞ্জাবি চেপে ধরে রাগী গলায় বলি, 'স্কাউনড্রেল'!

পুলিন কাকা থামিয়ে দেন। ঘণ্টুকে জোর করে টেনে বাইরে নিয়ে যান।

নীলমণি জেঠা বলে, 'অত রেগে যাস কেন তুফান? ভাল মন্দের সংসার। সবাইকে নিয়ে চলতে শেখ।'

অবাক হয়ে ওর কথা শুনি। যা সচরাচর করি না, তাই করে ফেলি। নীলমণি জেঠাকে প্রণাম করে বলি, 'তুমি যদি আমার পাশে থাকতে জেঠা, তা'হলে বুঝতাম, আমার মাথার ওপরে বটগাছ আছে। কিন্তু কী করি, তোমাকে তো ধরে রাখতে পারবো না।'

নীলমণি জেঠা বলে, 'আর দেরি করিসনি তুফান, এবার চল বাবা ওখানে।'

ধীর পায়ে ওকে নিয়ে চোরবাগানের বাড়িতে আসি। আশ্চর্য হই এজন্য যে ও বাড়ির বুড়োরা প্রায় সকলেই ওকে চেনে। আনন্দঘন একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে মুহূর্তে ওকে ঘিরে।

নীলমণি জেঠাকে বলি, 'আমি চললাম জেঠা। ওদিককার ব্যাপারটা একটু সামলে নিই। আমার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'যাবি নিশ্চয়ই, তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখিস। আমার জন্য চিন্তা করিস না। এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেবো। তুই যা।'

কিন্তু আমি শেষ পর্যন্ত আলোচনা সভায় যাই না। এদিক ওদিক ঘুরে-ফিরে বাড়ি ফিরি।

বাড়ি এসেই গণা কাকার মুখে শুনি, আমার শাস্তি তো হয়ই নি, উপরন্তু ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে কেউ যেন আর অমন ধরনের ব্যবহার না করে, তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমি তো শুনে থ। ফলে সেদিনই বয়স্কদের কাছে গিয়ে নিজে যে ব্যবহার করেছিলাম, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে চারু কাকীমার ঘরে এসে অরূপকে দেখে বেশ খুশিই হই।

অরূপ বলে, 'বিচারসভায় তুমি ছিলে না, বড় চিন্তায় ছিলাম।'

'না থেকে ভালই করেছি বল।'

অরূপ বলে, 'অন্তত স্বস্তি পেয়েছি বলতে পার।'

একনজরেই মিঠুকে দেখি। ওর দৃষ্টি তখন অরূপের ওপরে নিবদ্ধ দেখতে পাই। মনে মনে না হেসে পারি না।

গল্পের আসরটা বোধ করি আমাকে পেয়ে বেশ জমে ওঠে।

॥ গণাকাকার কথা ॥

সূর্যকান্ত নামটা একদমই বেমামান আমার ছেলের ক্ষেত্রে। অনেকটা কানা ছেলের নাম পদ্মলোচনের মত। ছ'ছটো স্কুল থেকেই ওকে টি. সি. দিয়ে

তাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমবার বংশগৌরবের কথা মাথায় রেখে ও-স্কুল মুখো হইনি। বেয়াদপ মাস্টারগুলোর ওপর যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল করেছি, সে সবই সুয্যুর কানে গেছে। বেশ ফুলকি চালে ফিট বাবুটি হয়ে ও কোথায় না কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে কে জানে!

চারুর কথায় ওকে আর একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ির পেছন দিকেই ছিল সে স্কুল। মাস্টাররা আমাকে সম্ভবত চিনতো। খুব খাতির-যত্ন করে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। এত খাতির আমি খুব কম জায়গাতেই পেয়েছি। আর সে থেকেই আমার মনে হয়েছে, পৃথিবীতে গবেটের সীমা সংখ্যা নেই, কেননা, আমি যে কি বস্তু, তা ডিগ্রীধারী মাস্টারাও বুঝে উঠতে পারে নি বলে। সুয্যুকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে আসার পরই চারু জিজ্ঞেস করেছিল, হয়েছে তো?'

'হবে না মানে!' বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে চারুকে সে কথা বলেই মুচাক মুচকি হাসছিলাম। চারু বলল, 'আমার কেমন যেন ধন্ধ ছিল।'

'কিসের ধন্ধ?'

'সুয্যুর বয়স হয়েছে, তার ওপর টি.সি.র ব্যাপারটা আমাকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছিল।'

আমি বোধ হয় সেদিন খুব বেশি উৎফুল্ল ছিলাম। বলেছিলাম, 'এবার ফের টের পেলে তো আমাদের বংশের সুখ্যাতি; কত সুনাম।'

সে কথায় ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হেসেছিল চারু। বলে ছিল 'সে কী আর বলতে। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি! নোংরা, আবর্জনায় যাদের বাস তারা সুন্দরকে ছুঁতে পায় না বা চায় না। সুয্যুর জন্ম পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া কিছু নয়, ও ষাঁড়ের গোবর। কিছু হবে না ওকে দিয়ে।'

'মা হয়ে একথা বলতে বাধছে না'! আমি বলেছিলাম।

'তুমি ধৃতরাষ্ট্র হতে পার, কিন্তু আমি গান্ধারী নই।'

আমি অবাক হয়ে গিয়েছি, চারুর এ ধরনের ঘৃণা মেশান কথা বলতে দেখে। ওর ওই ব্যক্তিত্বের কাছে আমি খেই হারিয়ে ফেলি। হয়ে যাই প্রচণ্ড রকমের বেওকুফ। কী মনে করে বলেছিলাম, 'আমাকে তোমার কেমন মনে হয় চারু?'

প্রশ্নটা শুনে চারু হেসে বাঁচে না! বলেছিল, 'এতদিন পর এ প্রশ্নের কি মানে হয়? তাছাড়া তুমি…তুমি একটা…'

ব্যাকুল গলায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি চারু?'

'জন্মের ব্যাপারে তো কারো হাত নেই। তুমিও সেই আকস্মিকের দলে। যদি এ বাড়িতে না জন্মে অন্য কোথাও তোমার জন্ম হ'ত, তো আমার মনে হয়, তোমার চাকরের চাকর হবারও যোগ্যতা নেই।' শরীরে অপূর্ব লাস্য তুলে চারু কের বলেছিল, 'ভাগ্যের লেখা সে কি কেউ খণ্ডাতে পারে? আমি পারি নি, তুমিও পার নি। তাই তো তুমি আমার ইহকাল আর পরকাল। তুমি যেদিন আমার পা টিপে দাও সেদিন আমার কোন পাপ হচ্ছে বা অপরাধ হচ্ছে, এমন মনেই হয় না। বরং আমার মনে হয়, আমার যা প্রাপ্য, তা থেকে বোকমি করে নজেকে বঞ্চিত করবো কেন?

আমি চারুর সব কথা বুঝি না। চারু যখন অমন করে হাসে কথা বলে, আমি মুহূর্তেই ভিখিরি হয়ে যাই। কামকীটের দংশন আমাকে এমন অস্থির করে তোলে যে, আমি অসম্ভব অসহায় হয়ে পড়ি। ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে গেছে জেনেও আমি বেহায়ার মত চারুর সঙ্গে আচরণ করতে থাকি। চারু নিঃসাড়ে আমার সব উপদ্রব সহ্য করে এবং প্রতিবারই আমার কাছ থেকে তিন চারশো টাকা আদায় করে নেয়। আমি কৃপণ ঠিকই, কিন্তু চারুর কাছে আমি সিন্দুকের চাবি অবলীলায় তুলে দিতে পারি। অতগুলো টাকা চারুর কেন লাগে সে কথা জিজ্ঞেস করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি জরগদবের মত চারুর হাতে যখন টাকা তুলে দিই, চারু সে সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে, হাসে, কাঁদে। তাই আমাকে বিহ্বল করে দেয়, পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হয় আমার। প্রায়ই বলি, 'চারুসোনা তুমি আমাকে কখনো ঠকাবে না তো?' কেন বলি আমি জানি না।

চারু সে কথা শুনে খিলখিল করে হাসে। বলে, 'ছি' ও কথা মুখেও এনো না।'

'আমার কেন এরকম মনে হয় চারু?'

'তা আমি কি করে জানব!'

'তুমি সব জান।'

'আমি কি জ্যোতিষী নাকি?'

না তুমি গান্ধারী। গান্ধারী নাকি দূরদর্শী ছিল।

'ছিলই তো!'

আমি সহাস্যে বলি, 'তোমার সঙ্গে থেকে কেমন ভাষাজ্ঞান হয়েছে আমার। এর মূলে তুমিই আছ জেনে নিও'।

চারু গম্ভীর হয়ে যায় মুহূর্তে। বলে, 'অমন কথা তোমার মনে হয় কেন?'

'দেবতারাও নাকি নারীচরিত্র বুঝতে পারে না। তাই খুব ভয় হয় তোমাকে।'

চারু কী সব ভেবে নিচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ধরে আমার দিকে সরাসরি তাকায়। বলে, 'এত বড় বংশে তোমার জন্ম। সামান্য একজন মেয়েমানুষকে তুমি ভয় পাও?'

আমার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। আমি অবাক চোখে চারুর দিকে চেয়ে বলি, এরকম ভাষা তো তুমি কখনো ব্যবহার কর না। তুমি আমার বউ, মেয়েমানুষ হতে যাবে কেন? ওই শব্দটা আমরা বিশেষ উদ্দেশ্যেই বলে থাকি।'

চারু কটাক্ষ করে বলে, 'এ বাড়ির বউরা মেয়েমানুষ ছাড়া আর কী! মুখে তোমরা জেঠীমা, কাকীমা বলো বটে কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে তোমাদের কী ধরণের মানসিকতা তা কী জান না? হাঁটুর বয়সী ছেলেরাও ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে মেয়েদের শরীর চাটে। ঝিদের নিয়ে ফস্টি নস্টি করে। কাকা ভাইঝি, খুড়তুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনের মধ্যে কেমন সম্পর্ক তা কী তুমি এতদিনেও টের পাও নি? মেয়েদের মর্যাদা বলে কিছু আছে নাকি এ বাড়িতে?' আমি ভ্যাবলা চোখে চারুকে দেখি! ওর কথাগুলো নিখাদ সত্যি, তা অস্বীকার করতে পারি না। আমি চিনি শুধু টাকা। আর শরীরের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে চারুকে ব্যবহার করি। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে চারু ফের বলল, 'সূর্যকান্ত আমাদেরই ছেলে। ও যে কি বস্তু তা টের পেয়েছো নিশ্চয়ই। গত বছর সুয্যি কুড়িতে পা দিল, কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে সতেরো করেছ। এমন একটা দামড়া ছেলে আমার পেটে না জন্মালেই পারত। অপকর্মের ঢেঁকি। দুপুরে ওকে বাড়িতে রাখা বিপজ্জনক মনে করে আমি জোর করেই তোমাকে আর একটা স্কুলে ভর্তি করতে বলেছিলাম। তুমি করেওছো। কিন্তু ওর কোনই ভবিষ্যৎ নেই। এইতো সেদিন নাড়ুর ঝিকে পান কিনে খাওয়াল। হারামজাদা। এ বয়সেই আহার, নিদ্রা, মৈথুন ছাড়া কিছুই শিখল না।' বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারু।

চারুর কথার কি উত্তর দেব ভেবে পাই না। সুয্যির অপকর্ম চোখে দেখেও চোখ ফিরিয়ে রাখি। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'ওকে স্কুলে ভর্তি করাটা কি ঠিক হ'ল?'

'হয় নি জানি। তবু এছাড়া আমাদের কোন পথই খোলা নেই।'

'ওর পাল্লায় পড়ে আর দশটা ছেলে যে বখে যাবে।'

'ঠিকই বলেছ তুমি। ও এখন বাড়ির জুয়ার আড্ডায় ভিড়েছে। ফাই-ফরমাস খাটে। টুকটাক পয়সা সরায়। মাঝে মধ্যে সিদ্ধির নেশা করে। আর বাড়ির ধেড়ে শুয়োরগুলোই বা কি! ওকে ওখানে ঢুকতে না দিলেই তো পারে।'

চারু বলে, 'এ বংশের ছেলে জুয়া খেলবে না, ঝি নিয়ে ফূর্তি মারবে না, ঘুলঘুলি দিয়ে বোনের, কাকী, জেঠীর শরীর দেখবে না, রেসের বই পকেটে রাখবে না, ঘোড়ার পেডিগ্রি মুখস্থ করবে না, তা কি কখনো হয় ? হয় না।'

আমি নিঃশব্দে চারুর বাক্যবাণ হজম করি। সহ্যশক্তি আমার মজ্জাগত। ফ্যাকাশে হেসে বলি, 'রেসকে জুয়া ধরছো কেন চারু ? ওটাকে স্পোর্টস হিসেবে নাও, দেখবে কী মজা ! আমাদের মিয়োন জীবনে ও হচ্ছে এক নম্বরের সালসা। তবে ওই তিনতাসের আড্ডাকে আমি খুব ঘেন্না করি।'

চারু কথা বাড়ায় না। ও আমাকে অপাঙ্গে দেখে চলে যায়। সে দেখায় ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য ছাড়া আর কিছুই নেই এটা বোঝবার মত মাথা আমার আছে।

সে সময় চোস্ত-পাঞ্জাবি পরে সূর্যকান্ত হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে। আমার রেসের বই আমারই সামনে খুলে একমনে দেখতে থাকে। আর রেসের বই ওকে খুব ছেলেবেলায় আমিই চিনিয়েছিলাম। আমি লোভাতুর হয়ে সূর্য-কান্তের দিকে চেয়ে থাকি। ও আমাকে দেখেই চোখ নামিয়ে বলে, 'মাল কামানোর ইচ্ছে আছে তো বলো ?'

'কী যে বলিস না সূয্যি ! টাকা এ জগতের সেরা বস্তু। এর জোর না থাকলে জীবনে বেঁচে সুখ কী ? আমি উত্তর দিই।'

সূর্যকান্ত গম্ভীর মুখ করে বলে, 'ও সব ছাড়ো। নতুন স্কুল থেকে আবার আমার নামে চিঠি আসবে। আমি ওসব লেখাপড়ায় পেচ্ছাব করি। পেট-ফুলো টেকো, হাড় জিরজিরে কতকগুলো লোক মাস্টার সেজে সং দেখায়। সব ব্যাটা মুখস্থ বিদ্যের জাহাজ। মালের খবর রাখে না, ঘোড়ার খবর রাখে না, খালি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার আর এ্যানালিসিস নিয়ে পড়ে আছে। ক্লাসে বসে থাকলে হাই ওঠে। ঘোড়ার মাঠের 'সিলভার কুইন' আর' রেড স্পট' খালি হাতছানি দিয়ে ডাকে, কি দৃশ্য ? কত লোক হাসছে, কাঁদছে, বন্ধকী কারবার করছে ...

আমি আরও হ্যাংলা হয়ে উঠি। বাপ-ছেলের সম্পর্ক ধাঁ করে মাথা থেকে উবে যায়। ও মুহূর্তেই আমার ইয়ার হয়ে পড়ে। মুখ আলগা হয়ে যায় আমার। ফস্ করে বলেই ফেলি, 'সূয্যিরে, ওসব ছাড়। একটা টিপস্ দে।

কত জায়গায় ঘুরিস। শরীরের গাঁটে গাঁটে মরচে পড়ে গেছে। একটু শানিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে।'

সূর্যকান্ত হো হো করে হাসে সে কথায়। বলে, 'তুমি না সত্যি একটা বুদ্ধু আছ।'

ও আমাকে বুদ্ধু বললেও গায়ে মাখি না। ওকে তোষামোদ করতে থাকি ক্রমাগত। শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। অশ্বক্ষুরধ্বনি আমাকে পাগল করে দেয়। আমি ভিখিরির মত ওর দিকে চেয়ে থাকি। সূর্যকান্ত বলে 'তাহ'লে কপাল ঠুকে 'কাশ্মীর কী কলি' আর 'মর্নিং ডিউ'-কে ব্যাক করো। 'শ' দেড়েকের বেশি খেলো না। ঝাড় খেলেও অল্পের ওপরেই খাবে।'

ওর মুখ থেকে ও দুটো নাম কানে যেতেই বুকের মাঝে ঝম ঝম বৃষ্টি শুরু হয়। আর বেশিক্ষণ দাঁড়াই না। পাশের ঘরে মিঠুকে একমনে পড়ার বইয়ে মগ্ন থাকতে দেখি। বড় লজ্জা হয় এসময় ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। ও কি আমার আর সুয্যির কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে? যদি পেয়ে থাকে, তো আমার সম্পর্কে ওর কি ধারণা হ'ল, তা জানার কৌতূহল হলেও, মুখ ফুটে কিছুই জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলাম না।

চারু শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'এবার থেকে ভাল বেশ্যা কোথায় পাওয়া যায় সুয্যির কাছ থেকে তাও জেনে নিও।'

চমকে তাকায় মিঠু। পরক্ষণেই মুখ নামিয়ে নিয়ে বলে, 'এঘর থেকে বেরিয়ে যাও তো।'

কি অসম্ভব ঋজু মিঠুর কণ্ঠস্বর।

আমি আর চারু কথা বাড়াতে সাহস পাইনা। চোরের মত নিঃশব্দে দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। অন্যের ক্ষেত্রে কি হ'ত এসময় তা তো আমার জানার কথা নয়, আমি গবেটের মত চারুর সঙ্গে একটু ছল্লপনা করার চেষ্টা করি। চারু আমল দেয় না, মুখটা ওর তেলতেলে হয়ে ওঠে। ওই চেহারা আমার খুব চেনা। আজ সারারাত আমাকে জেগে থাকতে হবে, চাই কি, চারুর কথা মত পা-ও টিপে দিতে হতে পারে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে। তাতেই আমি আহ্লাদে ডগমগ হয়ে যাই। 'কাশ্মীর কী কলি' আর মর্নিং ডিউ' মনের এককোণে চলে যায়। কামকীটের দংশন আমাকে বাহ্যজ্ঞানহীন করে তোলে।

চারুকে বলি, 'বেশ্যা বাড়ি কখনো কি গেছি চারু?'

চারু হিলহিলে সাপের মত আমার দিকে তাকায়। বলে, 'সে কি গো! যাও নি নাকি? কিন্তু রক্তে যে বিষ আছে তা তো অস্বীকার করতে পারবে না?'

আমি গুম মেরে যাই। সত্যিই তো রক্তে আমার অনেক বিষ আছে, তাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকি।

চারু ব্যঙ্গের ছুরি ঝলসে বলে, 'যাবে নাকি বেনারস? সুরেশ মুখুজ্জের ছেলে তুমি, ভাল মাকে একবার দেখে এলেই পার। বুড়িটা এখনও তোমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে, যাওনা, ঘুরেই এসো একবার।'

আমি যত গবেটই হই না কেন, মুখ ফস্কে, চারুর আদরে খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে কখনো বাবার গোপন কথা ফাঁস করিনি। এ বাড়িতে সব সময় শয়তানেরা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়; আর সেই শয়তান হচ্ছে বাড়ির মেয়েরা। বাবা বেনারস বেড়াতে গিয়ে একজন বাঈজীর প্রেমে পড়েছিলেন, বাড়িতে আমার মা, আমার কথা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলেন। ছ'মাসের মধ্যে আমার মা-কে বাবা কোন সংবাদই পাঠান নি। মা বোধ হয় বাবার চরিত্র কী তা টের পেয়েছিলেন। না পাওয়ার তো কোন কারণই ছিলনা। সে তো ইংরেজ আমলের জমজমাট সময়। অর্থকৌলিন্য যাদের আছে, তারা যদি একটু-আধটু মদ মেয়ে মানুষে আসক্ত না হয় তা হলে সে বংশের যে বড় অগৌরব! বাড়ির মহিলারাও সম্ভবত এ সব পুরুষদের ক্ষেত্রে না হলেই মনে মনে ক্ষুণ্ন হ'ত। হয়তো বা ভাবতো, আভিজাত্যের অগৌরব হচ্ছে। ব্যাপারটা চারু জেনেছিল, বাড়ির মহিলা মহলের কাছ থেকেই।

একদিন রাতে সূর্যকান্ত তখনও হয়নি, চারু জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ক'বার বেশ্যাবাড়ি গেছ গো?'

আমি চারুকে ছুঁয়ে বলেছিলাম, মা কালীর দিব্যি, ও রাস্তা কখনও মাড়াই নি।'

'বাপ পথ দেখাল, ছেলে হয়ে সেদিকে গেলে না, এ যে ঘোর অধর্মের কাজ করেছ' বলেই সে কি হাসি চারুর।

আমি বলেছিলাম ওসব দিনকাল এখন আর নেই। ফুর্তি মারবে এখন বিজনেসম্যানরা, আমি বেশ আছি তোমাকে নিয়ে। আর বেঁচে থাক আমার দালালি।'

চারু মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলে, 'কত স্বপ্ন দেখেছিলাম, সাতরাজ্য জয় করে রাজপুত্রের হাত ধরে রাজবাড়ির বউ হব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ...

ওকে কথা শেষ করতে দিই না আমি; বলেছিলাম, 'তুমি না চাইলে দালালি আমি ছেড়ে দোব।'

চারুর চোখ চকচক করছিল জলে, বলেছিল, 'আমাকে পার করতে বাবার এক পয়সাও লাগেনি…আমি খুব সুখী।'

চারুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বেশিক্ষণ সম্ভব নয়। একটু আগের মনোভাব মুহূর্তেই মন থেকে মুছে যায়। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বড় স্বস্তি অনুভব করি। মনে পড়ে যায় সূর্যকান্তর কথা 'কাশ্মীর কী কলি' আর 'মর্নিং ভিউ'কে। ঘাড় বাঁকিয়ে ছুটতে দেখি চোখের সামনে। অনেকগুলো গোমড়া মুখের মাঝে বেলা দেড়টার মধ্যে ঠিক পৌঁছে যাই রেসকোর্সের মাঠে।

॥ সূর্যকান্তর কথা ॥

আমি যে জজ-ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য জন্মাইনি এটা আমার বাবা-মা কিছুতেই বুঝতে চায় না। নাকি বুঝেও বোঝে না? দু'দুবার স্কুল থেকে টি. সি. দিল আমাকে, বাবা মুখ খিস্তির ঝড় তুললো বাড়িতে। এইসব 'শ-কার' 'ব-কার' শুনতে ভালই লাগে, রক্ত চনমন করে ওঠে। এমন বাপ ক'জনার কপালে জোটে! ওই যে বলে না, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম · ধ্যুৎ, ওসব বস্তাপচা শব্দ আর যাকেই হোক, আমাকে ভোলাতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, বাবা সরেস মাল। রেস, দালালি আর মা-র সঙ্গে ধস্টামিতে ওস্তাদ। আমি যে আমি, সে-ই কিনা এক একসময় বাবার কাণ্ডকীর্তি দেখে চোখ বুজে ফেলি। সিনেমার নায়িকাদের মত ঢং মা-র। তবে হ্যাঁ, ছেলে হয়ে একথা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারিনা, মাকে শুধু সুন্দরী বললে ছোট করা হয়, মা স্বর্গের উর্বশী, মেনকার মতই সুন্দরী। মেয়েছেলে জাতটা অদ্ভুত। একটু ঠাট-ঠমক যদি শরীর থেকে উগরে দিতে পারে তো, মুনি ঋষিরাও পায়ে হুমাড় খেয়ে পড়ে। আমার বাবা গণা মুখুজ্জের আর দোষ কি!'

সৃষ্টি করার জন্য যে আমার জন্ম নয়, তা আমি এ বাড়ির আবহাওয়াতেই টের পেয়েছি। একটা পচা মাল দশটা ভাল মালকেও নষ্ট করে দিতে পারে। আমি সেই পচা মালের গোত্রের। হাটখোলার মিত্তির আর বাগবাজারের দত্তরাও নাকি আমাদের বংশের মত পুরোন। ও দুটো পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপা অকৃপণ। কিন্তু আমাদের বংশে এককালে লক্ষ্মী আর সরস্বতীর আশ্চর্য সহাবস্থান ছিল। এখন সরস্বতী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ভালই হয়েছে, অলক্ষ্মীদেরই লক্ষ্মীর পছন্দ বেশি, তাই এখনো মুখুজ্জে বংশে লক্ষ্মীর পায়ের তোড়ার শব্দ ঝুমঝুম ক'রে এ বাড়িরই কারো কারো ঘরে বাজে। সেই সৌভাগ্য

গণা মুখুজ্জের অছে, ফলে আমারও। যা বলছিলাম। প্রথম যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, সেখানে ওই মিত্তির আর দত্ত বংশের ছেলেরাও পড়তো। কেমন শুভ বয়, শুভ বয় চেহারা। মাস্টাররা পড়া জিজ্ঞেস করলে ওরাই হাত তোলে প্রথমে। আর আমি রোজই বেঞ্চে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওদের আমি সর্বনাশের চুড়োয় তুলে তবে ছাড়ব। অর্থ কৌলিন্যের জোরে ভাব জমাতে একটুও অসুবিধে হ'ল না আমার। ওরাও বোধহয় সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে ছাড়া অন্য ছেলেদের সঙ্গে বেশি মেলামেশায় পক্ষপাতি ছিল না। মাস্টারদের কাছে গর্দভ বলে প্রতিপন্ন হলেও, আমাকে নিয়ে কেউ-ই বিদ্রূপ করতে সাহস পেত না। সম্ভবত সেটা আমার চেহারার জৌলুস। আমার শরীরে তো অষ্টপ্রহর শয়তানের হাওয়াই লাগছে। ফলে ঘণ্টু কাকার কাছ থেকে অশ্লীল ছবি আর বইয়ের নেশা ধরে গিয়েছিল, এ যে কি নেশা তা আমার মত যারা, তারা ছাড়া কেউই বুঝতে পারবে না। তাই একটু একটু করে ওদের অর্থাৎ মিত্তির আর দত্তদের কানে তুলে ধরলাম, চোখেও দেখালাম। ওরা প্রথম প্রথম লজ্জায় লাল হয়ে যেত। আমারও প্রথম প্রথম ওরকম হয়েছিল, তা ঘণ্টু কাকা বেশ প্রত্যয়ী ভঙ্গিতে আমাকে ধাতস্থ করে তুলেছিল। সেই কৌশলটা আমি ওদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে থাকি। কিছুদিনের মধ্যে ওরাই আমাকে চাপ দিতে লাগল, আরও ছবি আর বই পড়াবার জন্য। ভীষণ খুশি হয়ে আমি বলেছিলাম, 'বইয়ের পাতায় যা তা নিয়ে জীবন চলে না, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে গেলে ওসব চাই-ই চাই।' আমার জয় হল বটে কিন্তু ওই হুমদো মাস্টারগুলো টের পেয়ে গেল এবং কোন কিছু আমাকে না জানিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্কুল থেকে টি. সি. দিয়ে দিল। এরপর আর একটা স্কুলেও তাই হ'ল। আমি তো তাই চাইছিলাম। কিন্তু মা-কে নিয়েই হয়েছে বড় ঝামেলা। গণা মুখুজ্জে মা'র কাছে ধরাশায়ী হয়ে গেলেন আর আমারও জেদ চেপে গেল, এবারও ওই গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে আমাকে। টের পেয়ে মাকে বাবাকে বলেই ফেললাম, স্কুলের ঝুটঝামেলায় আমি আর নেই, এতে তোমরা ভাল বোঝ আর মন্দ বোঝ।' খেলা শেষ করতে গেলে এছাড়া আমার আমার আর কোন পথই ছিল না। বাবার কপাল খুব ভাল বলতে হবে। ছ'সাত বছর বয়সে বাবা আমাকে রেসের বই চিনতে শিখিয়েছিলেন। একদিন বাবা বলেছিলেন, 'এই সূর্য্য এদিকে আয়।'

তখন সত্যি বলতে কি আমি এই ছিলুম না। নিষ্পাপ, পবিত্র এ-সব শব্দগুলোই আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'তে পারত। এখন আমার দু'জন গুরু। এক হচ্ছে বাবা, আর একজন ঘণ্টুকাকা। বাবা চিনিয়েছে ঘোড়া, ঘণ্টুকাকা চিনিয়েছে মেয়েমানুষের শরীরের রহস্য আর জুয়া। মদ ভাঙ এ সবই আমি বাড়ির পরিবেশ থেকে অর্জন করেছি। তাই বাবার কথা আগে না বললে, আমার কথা অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে।

সোদনের সেই ডাকে আমি কম্পিত পায়ে বাবার কাছে হাজির হয়েছিলাম। আমার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'এ পাতায় সাতটা নম্বর আছে, তার মধ্যে একটায় তুই আঙুল ছোঁয়াবি।'

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এসব কি বাবা?'

বাবা একটুও রেখে ঢেকে উত্তর দেন নি. বলেছিলেন 'ঘোড়দৌড়।'

আমি আবদার করে বলেছিলাম, 'ঘোড়দৌড় কখনো দেখিনি বাবা, আমি ঘোড়দৌড় দেখব।'

'দেখবি নিশ্চয়ই। পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মে এ লাইনে একবার চক্কর না মারলে লোকে বোকা পাঁঠা বলবে। সব দেখে শুনে একটায় আঙুল ছোঁয়া তো। কতজন ট্রিপল টোট পায়, আমার কপালে আজও সেটা জোটে নি। তোর ভাগ্যে যদি পাই তো তোকে নিয়ে আমি উড়োজাহাজে চেপে কাশ্মীর বেড়াতে যাব।'

কাশ্মীরের কথা বইয়ে পড়েছিলাম। ভূ-স্বর্গ না কি যেন। খুশির স্রোতে ভাসতে ভাসতে একটা নম্বরে আঙুল রাখি। বাবা গম্ভীর হয়ে যান। বলেন 'ধুস. ল্যাংড়াকে ব্যাক করতে বলছিস। জীবনে এ এখনো পয়লা নম্বরে আসে নি।' বললেন বটে এই কথা, কিন্তু বাবাকে দেখি লাল কালি দিয়ে দাগাতে সেই নম্বরটা। পরপর তিনটে পাতায় ওই একই কাজ করতে হল আমাকে। মা তার আগের দিন তাঁর গুরুদেবের জন্মোৎসবে গিয়েছিলেন। মিঠুও ছিল না ঘরে। বাবা আমার দেখানো নম্বরগুলোতে সব ক'টাতেই কালির আঁচড় দিয়েছিলেন। এবং দুপুরে ফিট-বাবুটি সেজে আমাকে বলেছিলেন, 'জয় হোক যুযু, তোর জয় হোক। বলেই ঘর থেকে আমাকে না নিয়েই বেরিয়ে গেলেন। আমি একা ঘরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবতে শুরু করি। বেশিক্ষণ কোন কিছুই আমি ভাবতে পারি না। ঘুমের আঠায় দু'চোখ জড়িয়ে আসে। বাবা বিকেলে ট্যাক্সি করে ফিরলেন। সাবেক কালের জমিদারী মেজাজে ট্যাক্সি থেকে

নেমে খুশি খুশি ভঙ্গি করে ট্যাক্সির ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে ট্যাক্সির ভাড়া মেটালেন। সিঁড়ি ভেঙ্গে আসতে আসতে বাবা আমার নাম ধরে খালি ডেকেই যাচ্ছিলেন। আমি কাছে যেতেই-বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করলেন।

আমি তো তাজ্জব বাবার এ ধরনের আচরণ দেখে।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি হয়েছে বাবা তোমার ?'

'কী হয়নি বলতে পারিস ? তুই এ বংশের লগন চাঁদা ছেলে। তোর সব ক'টা নম্বরই আজ বাজী জিতেছে। জীবনের একটা বড় দুঃখ আজ তোরই কপালে দূর করতে পেরেছি রে সুয্যি। মাত্র দশ টাকায় তেরো হাজার সাতশ' কামিয়েছি রে, বলেই পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন 'এ দিয়ে তুই যা ইচ্ছে খাস। তবে হ্যাঁ, তোর মাকে এসব ঘুণাক্ষরেও বলিস নে। বেঁচে থাক। তোকে জন্ম দিয়ে আমার জীবন সার্থক হয়েছে রে।' বলেই বাবা আদর করে আমার মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিতে থাকেন। আমি কিন্তু কেমন যেন বিস্মিত আর হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। বাবা বলে কী ? মাত্র দশটাকায় তেরোহাজার সাতশো। টাকা নাকি কত কষ্টে মানুষ রোজগার করে। আর বাবা প্রায় ফোকটসেই এতগুলো টাকা রোজগার করে ফেললেন। আর সেদিন থেকেই আমিও মনে মনে ঠিক করি, বাবার লাইনে আমাকেও যেতে হবে। এই কুড়ি বছর বয়সের মধ্যে যত না পেয়েছি, তার থেকে অনেক বেশি হারিয়েছি। বাবা-মা কেউই দেয় নি টাকা। এ রোজগারের কৌশল আমি ঘণ্টুকাকার কাছ থেকে জেনেছি। সে কথায় এবার আসবো।

আহা কি অপূর্ব চরিত্রের মানুষই না হচ্ছে আমার ঘণ্টুকাকা। ও আমার কাকাই, তবে আপন নয়। অনেক বড় পরিবারের লতায় পাতায় জড়ানো সম্পর্কিত এক কাকা। চুনোট করা ধুতি আর গিলে করা পাঞ্জাবি পরে থাকে ঘণ্টুকাকা সবসময়। গায়ে সেন্টের গন্ধ ভুরভুর করে। মুখে জর্দা পান।

জিজ্ঞেস করছিলাম ঘণ্টুকাকাকে, 'তুমি সিগ্রেট খাও না কেন ?

ও তো আমার প্রশ্ন শুনে হেসেই বাঁচে না। বলে, 'সিগ্রেটে কোন মৌতাত নেই রে। খেয়ে দেখেছি ভুস ভুস করে শুধু ধোঁয়াই বেরোয়। সাঁট করে দুটো হুইস্কি মেরে দিলে, নিজেকে রাজা বাদশা বলে মনে হয়। তুই তো এখনও দুধের বাচ্চা, আর দুটো বছর যাক, তোকেও নাড়া বেঁধে দোব ও লাইনে।'

আমার খুব আত্মসম্মানে লাগে। ঝাঁঝিয়ে বলি, 'এখন আমার উনিশ চলছে জান?'

ঘণ্টুকাকা হো হো করে হাসে। মুখে ফিচেল হাসি বজায় রেখেই বলে, 'তবে আর কি। তোর বয়সে আমার ঠাকুর্দা বাপ হয়ে গিয়েছিল। শালার আইন কানুনের পাছায় লাথি। সবাই এটা চাই ওটা চাই বলে চেল্লাচ্ছে। আরে বাবা, জীবনেই স্বাধীনতাই যদি না থাকল তো, কিসের জীবন। তুই বল, মেয়েমানুষ দেখলে তোর মনে সিরসিরে ভাব হয় কিনা? ওদের বুক পাছা পায়ের গোছ আমি মা কালীর দিব্যি দিয়ে বলতে পারি ওসব দেখলে আমি আর আমাতে থাকি না। কে কি সম্পর্কের সে সব বেমালুম ভুলে যাই,। আজ তোকে একটা জিনিস দেখাব সূয্যু।' কি যে এক রহস্যের টান ঘণ্টুকাকার পেছু পেছু আমাকে নিয়ে বেড়ায়, কেমন এক অমোঘ আকর্ষণ আমাকে পাগল করে তোলে। জিজ্ঞেস করি, 'কী দেখাবে বলই না মাইরি'।

ঘণ্টুকাকা আমার উরুতে জোর থাপ্পড় কষিয়ে দিয়ে বলে, 'সাবাস! জানিস তো, যে মানুষের কামনা নেই, সে তোর বাবার মতোই গবেট।'

বাবাকে গবেট বললেও আমি প্রতিবাদ করি না, কেন না, বাবার সম্পর্কে আমারও যে খুব একটা শ্রদ্ধা আছে তা বলি কী করে! বলি 'তুমি আমাকে শিষ্য করে নাও ঘণ্টুকাকা!'

'নাও কী রে? নাড়া বেঁধেই দিয়েছি বলতে পারিস। তবে হ্যাঁ, মালকড়ি না থাকলে ও লাইনে সাইন করা যায় না। জানিস তো ইনভেস্টমেণ্ট নেই অথচ টাকা পকেটে খচখচ করবে, এ কখনও হয় না। গিভ এ্যাণ্ড টেক পলিসি। প্রথমে মেয়েদের শুধু গিভের পালা, তারপর হাতের মুঠোয় এলে শুধু টেক আর টেক। যত চাস পাবি।'

ঘণ্টুকাকার কথায় চোখের সামনে এক স্বপ্নরাজ্যের দুয়ার খুলে যায়। মনে হয় ওর হাতের মুঠোয় আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ লুকোন আছে। ঘষলেই বিরাটাকার দৈত্যটা এসে সেলাম করে বলবে, ফরমাইয়ে হুজুর।

ঘণ্টুকাকা আমার মুখের দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকে। বলে, 'তোকে আজ সন্ধেতে আমি ওই দক্ষিণের ঘরে ঢোকাব। শুধু তাই নয়, স্থায়ী মেম্বারশিপও জোগাড় করিয়ে দোব। তবে হ্যাঁ, এর জন্য তোকে কিন্তু সামান্য দৌড় ঝাঁপ করতে হবে।'

ব্যাপারটা মোটেই বোধগম্য হয় না আমার। আমি ভ্যাবা কার্তিকের মত ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

ঘণ্টুকাকা বলে, 'মেয়েদের শরীরে না অদ্ভুত গন্ধ আছে। কেউ কেউ বলে চন্দনের, কেউবা বলে গোলাপের। আমার না বাসমতী চালের ভাত থেকে যে গন্ধ বেরোয়, তাই নাকে লাগে। এই ক'দিন আগেই একজনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে খুব কেঁদেছিলাম রে।'

'কাঁদলে কেন?'

'সে তুই বুঝবি না রে। যেদিন প্রথম চুমু খাবি, সেদিন তুই-ও না কেঁদে পারবি না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঘণ্টুকাকা বলে, 'এবার যা পালা। তোর চোখ দেখেই মনে হচ্ছে, খুব ঘুম পেয়েছে তোর।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'সব কী করে তুমি টের পাও ঘণ্টুকাকা?'

ও এবার হাসে না। ফিচেল চোখে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'ওরকম আমারও হ'ত যে। তোতে আমাতে জমবে ভালো সুখ্যু। এ আমি হলপ করে বলতে পারি।'

খুশি খুশি মন নিয়ে ওর কাছ থেকে সরে নিজেদের ঘরে চলে আসি। মিঠু সে সময় কি একটা বই মন দিয়ে পড়ছিল। বইয়ের মধ্যে কি আছে বুঝি না। তবে দূর থেকেই মিঠুর মুখে খুশির জোয়ার বইছে টের পাই। এমনটাতো এর আগে মিঠুকে কখনই দেখতাম না। যদিও এ বাড়ির মেয়েদের থেকে মিঠু কেমন একটু আলাদা ধরনের, তবু এমন ভঙ্গি আমি এর আগে ওর মধ্যে দেখি নি। কেমন যেন হঠাৎই মাথার মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ে যায়। সে হচ্ছে অরূপ। মৃদুলের সহপাঠী। ঠিকই তো, অরূপ আসার পর থেকেই ও আরও বেশি আলাদা হয়ে গেছে সকলের থেকে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করে।

দাদাগিরি ফলাবার মতলব নিয়েই জিজ্ঞেস করি, 'কি এত পড়িস রে তুই?'

'সে জেনে তোর কি লাভ? ও সব তো আড়ি করে দিয়েছিস তুই।' মিঠু উত্তর দেয়?

বেশ হালকা লাগে মিঠুর কথায়। বলি, 'বেশ বলেছিস, আড়ি। ও সব গাড়োয়ানী বিদ্যেয় আমার কী লাভ?'

মিঠু খিলখিল করে হাসে। বলে, 'তোর যোগ্যতা কিসে, তা কি জানিস?' সত্যিই তো, আমি যে কিসে যোগ্য তা আজও ঠিক করতে পারি নি। সকলেই

কিছু না কিছু যোগ্যতার অধিকারী হয়। আমার অবস্থা সম্বন্ধে এই প্রথম বোধ হয় আমি চিন্তা করি। ওই যে, চিন্তাশক্তি আমার মাথায় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, ঘুম পায়। মিঠুর কথার উত্তর না দিয়ে আমি ঘুমকাতুরে শরীর মন নিয়ে শুয়ে পড়ি। মাত্র দু'তিন মিনিটের মধ্যেই আমি বিভোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি।

কতক্ষণ পর কে জানে মা আমাকে ডেকে তোলেন।

রাগী গলায় বলি, 'কেন ঘুম ভাঙাও?'

মা বলেন, 'রাগ করে না সোনারচাঁদ, তুমি যে না খেয়ে আছ এখনও।'

স্নান হয় নি; মা-র কথা কানে যেতেই ক্ষিদের তীব্রতা অনুভব করি। সত্যিই তো, এত বেলা পর্যন্ত আমি না খেয়ে আছি কি করে?' প্রশ্নটা আমাকে ভীষণ ভাবায়।

মা বলেন,'এই অবেলায় স্নান করে কাজ নেই, তুই বরং খেয়ে ফের ঘুমো।'

মিঠু সে কথায় হি হি করে হাসে

হাসুক গে! আমার কি যায় আসে। চটপট স্নান সেরে গোগ্রাসে খেয়ে বাধ্য ছেলের মত ফের শুয়ে পড়ি। শুধু সে সময় মা-র কথা আমার কানে যায়। মা শুধু বলেন, বেচারা।'

বেলা যখন প্রায় শেষ হয় হয়, সে সময় যথারীতি চা খাবার জন্য মা আমাকে জাগান। ঘুম চোখেই দেখি; অরূপ মিঠুর সঙ্গে হেসে কী সব বলাবলি করছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বেশ আরাম বোধ করি। মাকে দেখি, সাজায় ব্যস্ত। বাবা নিশ্চয়ই এখন শেয়ার মার্কেটে এ গদি ও গদি করে বেড়াচ্ছে। মিঠুর মুখ চোখ ভরাট দীঘির মত আমার মনে হয়। আমার বোন ও · তবু কেমন যেন, দূরের মানুষের মত ওকে মনে হয়।

ঘন্টুকাকার গলা শুনতে পেয়েই, আর কিছু ভাববার অবকাশ পাই না। এক লাফে বিছানা ছেড়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আসি।

ঘন্টুকাকা বলে, 'এ কী? এ পোশাকে দক্ষিণের ঘরে যাওয়া চলে না। সেজেগুজে সেন্ট মেখে আয়। আমি মিনিট পনেরো তোর জন্য অপেক্ষা করতে পারি।'

আমি যন্ত্র চালিতের মত ওর কথা পালন করার জন্য ফের নিজেদের ঘরে চলে আসি।

বেশ ভদ্রস্থ হয়ে ঘণ্টুকাকার দেওয়া ওই সময়ের মধ্যেই আমি নিচে নেমে আসি।

ঘণ্টুকাকা বলে, 'মেয়ে বাগান চেহারা তোর।' বলেই খপ্ করে আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে হাত দেখতে দেখতে বলে, শুক্র একেবারে ভুঙ্গে রে সুয্যু। তুই মাইরি সকলকে টপকে যাবি।'

ও কথায় নেশাগ্রস্থের মত সামান্য সময় ঘণ্টুকাকার মুখের দিকে চেয়ে বলি, 'আর তুমি'?'

সে কথার উত্তর না দিয়ে ও আমাকে দক্ষিণের ঘরের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। বলে, 'ঘণ্টাখানেক বাদেই শুয়োরের বাচ্চারা মালে ডুবে যাবে, খেস্তাখিস্তি শুরু করবে। ওটাই হচ্ছে তোর আসল সময়। আমার চোখে চোখ রেখে ঝেড়ে দিবি দু'চারখানা নোট।'

'চুরি করবো ?'

ঘণ্টুকাকা মুচকি হেসে বলে, 'চুরি কেন বলছিস। ও হচ্ছে, চোরের ওপর বাটপারি করা। সব শালা বাপ কাকা জেঠার ট্যাঁক-ফাঁক করছে, তা তুই যদি ওসব হারামী গুলোর চোখে ধুলো দিয়ে কিছু সরাতে পারিস তো মন্দ কী। আর মাঝে মাঝে তোকে টাকা খুচরো করার জন্য বাইরে পাঠাবে, সোডা আনতে বলবে। একবারও না করিস নি। বুঝলি ?'

আমি সমঝদারের মত ভঙ্গি করে মাথা নাড়াই।

হঠাৎ ঘণ্টুকাকা বলে, 'ঘরে গিয়ে কি দেখলি ?'

বলতে যাব ঠিক সেই সময় বিজনদাকে লপেটা পোশাকে দক্ষিণের ঘরে যেতে দেখেই চাপা গলায় বলি, 'জানো, বিজনদা না সুমি ঝি-কে নিয়ে খুব আদর করে।'

ঘণ্টুকাকা বলে, 'হিংসে মহাপাপ। জগৎ আনন্দময়, বুঝলি। শুধু সময়ের অপেক্ষায় বসে থাক। দেখবি, সুমি কেন, সুমির চোদ্দ পুরুষ তোর বংশবদ হয়ে গেছে। আমার দাদা সন্ত, সারাদিন সারারাত ভো-কাট্টা ভো-কাট্টা করছে। কেন জানিস ?'

'কি করে জানব বল ? তুমিই তো বল, আমার নাক টিপলে দুধ বেরোয়।' বলেই আমিও ফিচেল হাসি।

ঘণ্টুকাকা বলে, 'গণাদা'র ছেলে হয়ে তুই বাপের নাম রাখবি উল্টোভাবে। একদম তেঁতুলে বিছে তুই। দরজার মুখে দাঁড়িয়েই আমাকে সাবধান করে দেয় ঘণ্টুকাকা। বলে, 'তোকে যে ভাবে ও ঘরে ঢোকাব তাতে কিছু মনে করবি নে কিন্তু।'

'কি বলবে?' ছুরু ছুরু বুকে জিজ্ঞেস করি।

'চলই না। শুধু এই হাসিটা মুখে রাখবি, বুঝলি?'

এবারও সম্মতিতে ঘাড় নাড়াই আমি। ঘণ্টুকাকার পেছন পেছন ঘরে ঢুকতেই সকলেই আমাকে কেমন কেমন চোখে দেখে।

ঘণ্টুকাকা বলে, 'এই মালটিকে তোমাদের কাছে হাজির করছি আজ থেকে। ফাইফরমাস খাটবে দেখো মুখটি বুজে। আর কোন ঝামেলা হবে না, হ্যাঁ।'

বিজনদা আমাকে ক্রুর ভঙ্গিতে দেখে বলে, 'এই কোলা ব্যাঙটাকে তুমি কী কাজের ভেবেছ?

'আলবাৎ। কার মধ্যে কি আছে, তা ওপর থেকে দেখে বোঝা যায় না।' ঘণ্টুকাকা হেসে আমার দিকে তাকায়।

আমিও হাসি হাসি মুখ করে সকলের দিকে চাই।

বিজনদা বলে, 'ওটাকে আমার পাশে বসিয়ে দে।'

আমি ঘণ্টুকাকার ইশারা পেয়েই বিজনদার পাশে ঝুপ করে বসে পড়ি।

বিজনদা বলে, 'ভুল করেছিস কি, লাথি মেরে তাড়িয়ে দোব।'

আমি একটা সিগ্রেট এগিয়ে দিয়ে বলি, 'বিজনদা আমি সিগ্রেট ধরিয়ে দিচ্ছি, দেখবে লাক তোমার কোথায় গিয়ে ঠেকে।' বলি বটে, কিন্তু বুকের ভেতরে ভয়ের ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়।

ঘণ্টুকাকার চোখে চোখ যেতেই বুঝি, চালটা পাকা খেলুড়েদের মতই দিয়েছি।

খেলা চলছিল। এক সময় সকলেই তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ল। আমি সকলকে মেপে মেপে গেলাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দিতে থাকলাম, কাজ এমন নিখুঁত হল, বিজনদা পিঠ চাপড়ে বলল, 'সাবাস ব্রাদার। আজ থেকে তোর এ ঘরে আসা-যাওয়া পার্মানেণ্ট হয়ে গেল।'

আমার কেবলই মনে হতে লাগল, খেলতে যখন নেমেছি, এর শেষ না দেখে আমি ছাড়ব না।

মিঠুর কথা

অরূপ চলে যেতেই এক ঝাঁক লজ্জা মুহূর্তেই আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বাবা নির্বিকার ভঙ্গিতে পা নাচাচ্ছিলেন। মা'র চোখের ভাষা পড়া কঠিন তবুও

আমার এক ধরনের সুখ মনের মধ্যে টলটল করতে থাকে। ভেবে পাই না, কী করে ওদের সকলের সামনে স্পষ্ট ভাষায় বলেছি অরূপকে, আমার জন্যই এ-বাড়িতে আপনি আসবেন। বাবার জন্য বেশি ভাবি না, মাকে সব সময় বুঝতে পারি না। মা কি আমাকে বেহায়া ভাবলেন ?

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি দেখছো অমন করে ?'

মা উত্তর দেন, 'আমার সৃষ্টিকে।'

অবাক হয়ে গেলাম ও কথায়। সব কিছু কেমন গোলমেলে হয়ে যাবার উপক্রম।

মা বললেন,'কিছুই বুঝলি না তো ? এসব বুঝে তোর কাজ নেই। মুখে এল বলে ফেললাম।'

'উহুঁ। তুমি নিশ্চয়ই কিছু গোপন করছো ?'

মা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মুহূর্তে। কিছুটা স্বপ্নাবিষ্টের মত। মাকে ভীষণ অপরিচিত মনে হচ্ছিল সে সময়।

কেন জানি না, মা-কে স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছে হ'ল না আমার।

অনেক দূর থেকে কথা ভেসে এলে যেমন হয়, মা-ও ঠিক তেমনি অনেক অনেক দূর থেকে বলে উঠলেন, 'শিল্পী যেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর সৃষ্টির দিকে চেয়ে থাকেন, আমারও হয়েছে সেই দশা। তুইতো আমারই সৃষ্টি। আমার সব কল্পনা, সব স্বপ্ন তোতেই ধরা পড়েছে যে।'

ঠিক সে সময় বাবা গলা খাঁকারি দিয়ে বলেন, 'অত কাব্যি করে কথা বলা কেন ? সহজ, সরল করে কথা বলা কি ভুলে গেলে ?'

মা আবার বাস্তবে ফিরে এলেন। বললেন, 'এ বাড়িতে কেউ কাব্যি করবে, এটা ভাবাও ভুল।'

'ভুলই তো। কাব্য করে অলস, অপদার্থ মানুষেরা, যাক্ গে সে সব কথা। আমার কিন্তু ছেলেটিকে বেশ লেগেছে। ওকে মিঠুর টিউটর হিসেবে রেখে দি, ছেলেটির খিদে কম, অল্পেই পেট ভরবে মনে হয়।'

মা তীর্যক ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে বলেন, 'এখানেও তোমার হিসেব নিকেশ ?'

'কেন করবো না বলো। ওই সেদিন যে পালাটা দেখলে, তাতে বুড়ো ক্ষ্যাপা মানুষটা বলেন নি, যা কিনবি, দরদস্তুর করে কিনবি ?'

'আরও অনেক কিছুই তো বলেছিলেন। সে সব কই মনে রাখনি তো ?'

'দুধের সংগে জল মিশিয়ে দাও হাঁস দুধই খেয়ে নেবে, জল পড়ে থাকবে।'

মা আরও হাসেন। বলেন, 'বাঃ এইতো সব বুঝেছ, যারা তোমার মাথায় কিছু নেই বলে, তারাই আসল গবেট।'

'যারা আমাকে গবেট বলে, তাদের মুখে আমি

মা অমনি ধমকে বলে ওঠেন, 'বেশ তো ভালভাল কথা হচ্ছিল, ফের শয়তানের হাওয়ায় সব ভুলে গেলে যে!'

'হ্যাঁ, ছেলেটিকে আমারও ভাল লেগেছে, তবে কি জান, যোগ্য যে তাকে পুরো মর্যাদা দিতে হয়। না দিলে তার অসম্মান হয়।'

কোন সময় আমার দাদা সূর্যকান্ত এসে পড়েছে টের পাইনি। কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা বেড়াল পায়ে হাঁটে, ওর অবস্থাও ঠিক সেরকম।

হঠাৎ ও মাঝখান থেকে বলে ওঠে, 'কার মান-সম্মানের কথা হচ্ছে শুনি?'

মা বলেন, 'সে বোধবুদ্ধি কি তোর আছে?'

'কী যে বলনা?' বলেই তাচ্ছিল্যের ভাব করে মা'র দিকে চেয়ে থাকে দাদা।

মা'-র মুখ গনগনে আঁচের মত হয়ে ওঠে, বলেন, 'তুই একটা মানুষ নাকি যে সব কথার উত্তর দিতে হবে?

এ কথা শুনলে যে কোন মানুষেরই বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব। ওর সে সব তো হলই না, বরং শব্দ করে হাসতে শুরু করল।

বাবার পা নাচানি থেমে গেল মুহূর্তেই। মা-কে লক্ষ করে বললেন. 'তোমারই বা এত জেদ কিসের? বলেই ফেল না আসল কথাটা। ও সব টাকা-পয়সার ব্যাপারে স্বয্যু আসল জহুরী বুঝলে?'

'তুমি থাম।' মা প্রচণ্ড ধমক দেন বাবাকে।

মা'র ওই চেহারার সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি। ঘরের আবহাওয়া গুমোট হয়ে যায়। আমিও যেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।

বুঝি-বা পরিবেশটাকে হাল্কা করার জন্য আমি বলি, 'মৃত্যুলদার যে বন্ধুকে প্রায়ই দেখ, সেই অরূপবাবু আমার টিউটর হবে।'

চোখ বড় বড় করে তাকায় দাদা। বলে, 'ওই ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ল্যাকপেকে ছোকরা হবে তোরে টিউটর? বলি. ও কি জানে যে মিঠুকে পড়াবে? যাদের খাওয়া-পরার ঠিক নেই, সে করবে গুরুগিরি!'

মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে আমার। বয়সে ছোট না হলে হয়তো ঠাস

করে ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিতাম। বললাম, 'তুই তো বিদ্যের জাহাজ, সব বুঝে বসে আছিস। তার চেয়ে ওই জুয়ার আসরে গিয়ে বোস, কাজ দেবে। সিদ্ধি ভাং-এ ডুবে থাক গে যা।'

কথাগুলো এত সহজে নেয় দাদা যে কী বলবো। বলে, 'শিব ঠাকুরও তো সিদ্ধি-ভাং-এ ডুবে থাকে রে। তাহ'লে, জগৎ-সংসারের সকলে ওঁকে এত মান্যি করে কেন, পুজো দেয় কেন?'

বললাম, বাঃ, 'চমৎকার, এত জ্ঞান কোথায় রাখবি রে দাদা?'

বাবা সে কথায় হেসে ফেলেন। বলেন, 'যাই হোক সুষ্যু আমাদের বড় সন্তান। ওর জানার অধিকার আছে বইকি। তা শোন সুষ্যু, অরূপ ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল, এ সকলেই বলে। তাছাড়া শিক্ষিত বংশের ছেলে। ওকে আমিই ঠিক করেছি। মাসে তিরিশ টাকা দিলেই ও কুপোকাৎ হয়ে যাবে। মিঠুর লেখাপড়ায় মাথা ভাল, মিছিমিছি ওর ক্লাকটা নষ্ট করি কেন?'

দাদা কি ভেবে বলে, 'বুঝলে বাবা, আমি একটু মা-কে বাজিয়ে দেখছিলাম। ছেলেটা বখাটে নয়। তবে কি জান উঠতি বয়সের ছোকরা······

মা অমনি বলেন, 'নিজেদের বাড়ির ছেলেদের দিয়ে, সবাইকে বিচার করিস না সুষ্যু।'

আমি বাধা দিয়ে বলি, 'মৃদুলদাও তো এ বাড়ির ছেলে। ওঁর সামনে দাঁড়াবার স্পর্ধা এ বাড়ির কারো আছে নাকি?'

মৃদুলদার কথা শুনে কেমন কেন্নোর মত গুটিয়ে যায় দাদা। ইতস্তত করে বলে, 'তবে তিরিশ টাকা বড্ড হাই।'

'ঝি চাকরও তো কুড়ি-পঁচিশ নেয় রে?' মা বলেন।

আমি মা'র দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলি, 'অরূপবাবুকে ঝি-চাকরের পর্যায়ে ফেললে নাকি?'

'ছিঃ ছিঃ। ও ভাবা যে ভীষণ পাপ।' মা'র মুখ লজ্জারক্তিম হতে দেখি।

দাদা বলে, 'এ বাড়িতে কাজের লোককেই আমরা ঝি-চাকর মনে করি।'

'তোর মনে করা না করায় কী এসে যায়।'

কেন আসবে না। আমি কি ফালতু নাকি।

'ফালতুই তো।' আমি রাগত স্বরে উত্তর দিই।

দাদাও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'বেশি লপচপানি ভাল্লাগে না মিঠু। এ বাড়ির শালেরা যে কি, তা তোর থেকে আমি ভাল জানি। এক হপ্তা যেতে না যেতেই

দেখবি, তোর নামের সঙ্গে প্লাস চিহ্ন দিয়ে অরূপের নাম লেখা সারা বাড়ির দেয়ালে, তখন কি হবে শুনি?'

মা বলেন, 'লিখলে লিখবে। আর তোকেই বলি সূয্যি, ওদের মুখে লাথি কষাতে পারবি না। চিরকাল বুকে হেঁটে চলবি? মা-বোনের সম্মান যদি ছেলে আর দাদা হয়ে না বজায় রাখতে পারিস তো, কথা কোস কোন মুখে?'

দাদা কেমন নেতিয়ে যায় ও কথা শুনে। ফ্যাসফেসে গলায় বলে, 'ওই শালা ঘন্টু আর বুবাই তোমাকে নিয়েও যা-তা বলে, কিছু করতে পারি না। মৃদুলের মত আমার কেন বুকের জোর হ'ল না, বলতে পার?'

মা মুখ নিচু করে থাকেন কিছুক্ষণ। বলেন, 'সবই যখন বুঝিস তো, প্রতিশোধ নিতে পারিস না, মিছিমিছি ঘরে চেঁচামেচি না করে আমরা যা বলি তাই শোন। মৃদুলকে একবার ডেকে দে।'

'না বাবা। ও আমার দ্বারা হবে না। মিঠুকে বলো?'

আমি সহাস্যে বলি, 'কি বলতে হবে?'

'তোর কিছু বলার দরকার নেই; শুধু আমি ডেকেছি বলবি।'

ঘর ছেড়ে বেরোতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। সূর্যকান্ত আমার দাদা, ওর জন্যে বড় কষ্ট হয় সময় সময়। ওর অসহায়তা কী করুণ অথচ, আমার কিছুই করার নেই। বুকের মাঝে শূন্যতার গভীর একটা খাদ রচিত হয় মুহূর্তে।

ধীর পায়ে মৃদুলদার ঘরে এসে উপস্থিত হই। বাইরে থেকে বুঝতে পারি দ্বিতীয় কেউ ঘরে রয়েছে। কে রয়েছে জানতে পারলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু অরূপ যদি হয়? বুকের মাঝে আকস্মিক অঝোরে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যায়।

আমি কি ভীরু হরিণী, না, চাতক? হরিণীর কথা মনে এল কেন? অরূপ কি তাহ'লে হিংস্রপ্রাণী যে আমাকে গ্রাস করবে নির্মম ভাবে! আবার চাতক তাহ'লে কে? আমি কী? প্রখর গ্রীষ্মে যখন বিশ্বচরাচর তাপিত, দগ্ধ, সে সময়ই তো চাতক আকাশের দিকে মুখ করে শীতল জলের প্রার্থনা জানায়। আমি কি সেরকমেরই কেউ? আমি যদি চাতক, তবে অরূপ কি আমার কাছে স্ফটিক জল? প্রশ্ন করি নিজেরই মনে। এ সব ভাবালুতার কি কোন মানে হয়?

দুরু দুরু বুকে মৃদুলদার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হই। এবং কি আশ্চর্য অরূপের চোখে সামান্য সময়ের জন্য চেয়ে থাকি।

স্বপ্নময় এক জোড়া চোখ মেলে অরূপ আমাকে দেখে এবং ধীর প্রশান্ত গলায় বলে, 'এসো মিঠু, ভেতরে এসো।'

মৃদুলদা ফিরে তাকায়। আমাকে লক্ষ করে বলে, 'যদিও সকাল নয়, তবু বলছি মিঠু, দিন যাবে আজি ভাল। কি বার্তা আনিয়াছ শুনি?'

সব সঙ্কোচ, সব দ্বিধা এক নিমেষেই দূর হয়ে যায় আমার। একটু আগেকার ভাবনার কথা মনেই পড়ে না।

স্মিত হেসে বলি, 'দরবারে আপনার ডাক পড়েছে মৃদুলদা।'

যাত্রার নায়কের মত ভঙ্গি করে মৃদুলদা ভুরু কুঁচকে বলে, 'অসময়ে দরবারে আহ্বান! আকাশে কুটীল মেঘ, গভীর অমানিশা, পথভ্রান্ত হব না তো দূত। আশ্বাস দেহ মোরে।'

অরূপ আর আমি মৃদুলদার কথা বলার ভঙ্গি দেখে হেসে কুটি কুটি।

অরূপ সহাস্যে বলে, 'নির্ভয়ে যাও বৎস, প্রখর মধ্যাহ্নে........ '

ওকে শেষ করতে দেয় না মৃদুলদা, 'বলে ওঠে বিভ্রম! বিভ্রম!'

এবার বেশ চটে যায় অরূপ। বলে, 'চটপট শুনে আয়। আমি এখানে মিনিট পনেরো একা থাকতে পারবো।'

মৃদুলদা বলে, 'একা থাকবি কেন? মিঠুর সঙ্গে গল্প কর না। আর জানিস তো, একা যে সেই বোকা।'

বুকের ভেতরে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস শুরু হলেও আমি বাধা দিয়ে বলি, 'আমিও যাই।'

মৃদুলদা আমাকে বলে, 'অরূপকে তো চিনিস না, ওকে ধরে রাখা বড় কষ্ট। দু'এক মিনিট অপেক্ষা করবে ঠিকই, তারপরই এসে দেখবো, শূন্য মন্দির মোর। গপ্পে লোক, সঙ্গী না থাকলে হতাশ হয়।'

অরূপ হাসে, আমিও না হেসে পারি না।

মৃদুলদা বলে, 'আমি যাব আর আসব। তুই ওকে একটু আটকে রাখ মিঠু, বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মৃদুলদা।

কি কথা বলবো অরূপের সঙ্গে! আমি ভেবে পাই না। আর ওকে আটকে রাখবো কিসের জোরে!

এইসব যখন ভাবছিলাম ঠিক তখনই অরূপ বলে উঠল, 'অত সঙ্কোচ কিসের মিঠু? এমন ভাবে বসে আছ যেন আমি একটা হিংস্র জন্তু।'

আমি সামান্য হাসবার চেষ্টা করি। কিন্তু আড়ষ্টতা কিছুতেই কাটাতে পারি না।

অরূপ বলে, 'তোমার প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল।'

ভীষণ ভয়ে বুকের ভেতরটা খামচে ধরে আমাকে। অসম্ভব পিপাসার্ত হয়ে পড়ি।

অরূপ বলে, 'মৃদুল তোমার খুব গুণগ্রাহী।'

'কী গুণ দেখলেন আমার মধ্যে।'

'তা তো বলে নি। তবে, তোমার প্রশংসা করে খুব।'

'মৃদুলদার সবটাই বাড়াবাড়ি।'

'উহুঁ! ও বিনা কারণে কারো প্রশংসা করে না।'

'সে তো আপনার সম্পর্কেও অনেক ভাল ভাল কথা বলেছিলেন সেদিন মৃদুলদা।'

'ওটা ওর দুর্বলতা।'

'বারে! আপনার সম্পর্কে হলেই সেটা দুর্বলতা হবে তা হ'লে মৃদুলদার কি কোন ব্যক্তিত্বই নেই।'

'ব্যক্তিত্ব জিনিসটা এক একজনের কাছে এক এক রকম। একটু সময় চুপ করে থেকে অরূপ বলে, 'আর তোমার সম্পর্কে হলেই সেটা বাড়াবাড়ি হবে এটা ভাবলে কেন?'

'উনি আমাকে স্নেহ করেন তাই। 'আপনার ক্ষেত্রে মৃদুলদার ভালবাসা বলে কিছু নেই, এটা মনে করছেন কেন?'

অরূপ বলে, 'তোমার কাছে হার মানলুম মিঠু।'

'জিতেও তো যেতে পারেন।'

'সেটা এ ভাগ্যে নেই।'

'বড় বেশি ভাগ্য বিশ্বাস করেন দেখছি।'

'এ যুগের পালতোলা নৌকোয় আমি বেমানান। তাই মাঝে মাঝে বড় হতাশ হয়ে যাই।'

'বেঁচে থাকার এ-ও একটা দিক।'

'এতশত বোঝ কি করে মিঠু?'

'মুখে এল, বলে ফেললাম', বলেই হাসি।

অরূপের গলা কেমন কেঁপে যায়। বলে, 'এ জন্যই মৃদুল তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আর আমিও তোমার গুণগ্রাহী হয়ে গেলাম আজ থেকে। তোমার সঙ্গে কথা না বললে, বিরাট একটা ভুল আমার থেকে যেত। মৃদুলের জন্যই আজ তোমাকে এমন করে চিনতে পারলাম।'

মৃদুলদার দেরি হোক এই বুঝি আমি মনে মনে চাইছিলাম। জানিনা, আমাদের ঘরে এখন কি নাটক হচ্ছে। হোক, তাতে আমার কি যায় আসে? আমি শুধু একফালি আকাশের প্রার্থী। পচা, নোংরা, আবর্জনায় ভরা এই পরিবারে কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। বড় বেমানান আমি এ বাড়িতে। যেদিন প্রথম অরূপকে কাছ থেকে দেখেছিলাম, সেদিনই কেমন যেন ওর সম্পর্কে অন্য এক ধারণা মনে অঙ্কুরিত হয়েছিল। কেন যেন মনে হয়. এই সেই মানুষ, যে আমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারবে। অরূপের সম্পর্কে এক ধরণের শ্রদ্ধা জন্মেছিল সেদিনই। শ্রদ্ধা থেকেই কী ভালবাসার জন্ম হয়? ভালবাসা ব্যাপারটা কী মুখ ফুটে বলার মত কিছু। আমি জানি না, জানি না। আমার কেন যেন মনে হয়, ওই চার অক্ষরের শব্দটার ওজন অনেক বেশি। যা নিক্তি দিয়ে কেউ কখনও মাপতে পারেনি, আর পারবেও না। এই ভাবনা গুলো মনে এল আর সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে স্থায়ী প্রভাবের ছায়া ফেলল। আমি কী তাহ'লে, অরূপের প্রতি দুর্বল হয়েছি সেদিন থেকে। তাইতো, সেদিনই তো আমি ভেবেছিলাম, অরূপ আমার কাছে প্রচণ্ড রহস্যময় পুরুষ। কেন ভেবেছিলাম সে কথা!

ওসব ভাবনার জাল থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করেছিলাম, 'কি চিনলেন?'

'অনন্যা' অরূপ উত্তর দেয়।

'সে আবার কী? আমি তো সামান্য একটি মেয়ে। অতদূর ভাবা কী ঠিক হ'ল?'

তোমার মত করেই উত্তর দিচ্ছি, মনে এল, মুখে তার প্রকাশ হল। তবে কী জান…

ওর চোখে সরাসরি চোখ রেখে বলি, 'কিছু অজানা থাক না?'

'ঠিকই বলেছ, সব কিছু জানা হয়ে গেলে, পরে ভীষণ আপশোষ করতে হয়।'

'আপসোস করবেন কেন? ওসব দুর্বল মানুষদের মানায়। আমার মনে হয়, ওসব আপনাকে শোভা পায় না।'

অরূপ স্মিত হেসে বলল, 'তুমি যে আমাকে একেবারে দেবতার আসন দিয়ে ফেললে!'

আমি তার উত্তরে বলি, 'অত বোকা আমি নই। আপনি যে একশো ভাগ রক্ত মাংসের মানুষ তা বুঝতে ভুল হয়নি।'

অরূপ বলল, 'শুনেছি মেয়েদের নাকি তৃতীয় নয়ন থাকে।'

'সেটা কী পুরুষদের থাকে না বলতে চান?'

অরূপ বলল, 'শোনা কথায় বিশ্বাস ছিল না, এবার প্রত্যক্ষ করলাম। আমিঃ তর্কতীর্থ পরিবারের ছেলে কিন্তু সংস্কার আমাকে ডোবার পাঁকে ফেলতে পারে নি। আমাকে নিয়ে আমার বাবা খুবই চিন্তিত। ভাবেন, কোনদিন হয়তো নিরুদ্দেশে পাড়ি জমাব।'

আমি সামান্য সময় চুপ করে থেকে বলি, 'নিশ্চয়ই সে ভাবনার পেছনে কোন কারণ আছে?'

অরূপ ম্লান হেসে বলে, 'তা জানি না। অত তলিয়ে দেখার সময় কোথায় আমার?'

'কী করেন সারাদিন?'

'টো-টো কম্পানীর ম্যানেজারি।' বলেই অরূপ শব্দ করে হাসে।

আমিও হেসেই উত্তর দিই, 'ম্যানেজারিটা ভালই, তবে ওতে তো বেঁচে বর্তে থাকা যায় না।'

অরূপ গম্ভীর হয়ে যায় মুহূর্তে। বলে, 'কাকে বাঁচা বলে, কাকে মরা বলে, তা কি তুমি জান? তুমি কী সত্যি সত্যি বেঁচে আছ মিঠু?'

প্রশ্নটা এতই দুরূহ মনে হয় আমার কাছে, আমার সে সময় মনে হয়, সর্বাঙ্গে একটা বিরাট ময়াল সাপ আমাকে পেঁচিয়ে রয়েছে। দম বন্ধ হয়ে যাবার দশা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, 'এ বাড়ির কেউ বেঁচে নেই।'

'কেন মৃদুল, তুমি?'

'মৃদুলদার কথা বলতে পারবো না। আমার কথা বলি, 'আমি বেঁচে নেই। যদি সুযোগ পান তো আমার বলার প্রয়োজন হবে না, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।' করুণ মুখ করে হয় তো বা কথাগুলো বলেছিলাম আমি।'

অরূপের কিছু বলার আগেই মৃদুলদা ঘরে ঢুকল। ওর চলনে, বলনে ঝড়ো হাওয়া সর্বদাই সঙ্গী। সেটা আমার ভালই লাগে। কিন্তু আজ মৃদুলদা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল।

অরূপ মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এত উত্তেজিত কেন মৃদুল?'

'ছিঃ ছিঃ,' বলেই চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে মৃদুলদা?

আমি আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে মৃদুল দা?'

'নাঃ, কিছু না।' বলেই জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে থাকে মৃদুলদা।

অরূপ একবার আমার দিকে, আর একবার মৃদুলদার দিকে তাকায়। কি

ভেবে অরূপ বলে, 'আজ তাহ'লে আসি মৃদুল। উত্তেজনা থামলে, কাল একবার যেও।'

মৃদুলদা কোন উত্তরই দেয় না। অরূপ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকি। পরে এক সময় বলি, 'আমিও যাই 'মৃদুলদা।'

মৃদুলদা বলে, 'আগে এক গেলাস জল খাওয়া তো মিঠু।'

জলের গেলাস এগিয়ে দিই মৃদুলদার দিকে। এক চুমুকেই গেলাস শেষ করে আমাকে সরাসরি দেখে বলে, 'এ বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ।'

আমি বললাম, 'সে কি আপনি আজ টের পেলেন? আপনার থেকেছোট হলেও, আমি হাড়ে হাড়ে টের পাই –

মৃদুলদা বলে, 'জানিস মিঠু, তোরা যখন ঘরে কথা বলছিলি, তখন ওই হাড় বজ্জাত ঘণ্টুটা আড়ি পেতে সব শুনছিল। আমাকে দেখে যে সব কথা বলল, তা মুখে আনতেও ঘেন্না হয়। ও একটা জীবন্ত শয়তান।'

'জানি'।

শুধু এটুকু উত্তরই বোধ হয় মৃদুলদাকে বড় বেশি অবাক করে দিল। আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থেকে বলল, 'ভুলে যা ওসব। স্কাউনড্রেলটাকে একদিন আমি জ্যান্ত কবর দেবো।'

আমি হেসে বাঁচি-না। বলি, 'ওটাকে নিয়ে এত উত্তেজিত হওয়া ভাল নয় মৃদুলদা।'

মৃদুলদা বলে, 'এজন্যই ঠাকুর্দা আর বাবা সবগুলোকে পোষা কুকুরের মত মনে করতেন। এ বাড়ির বেশির ভাগ লোকই ওঁদের কৃপায় দুটো পয়সার মুখ দেখছে; শারিরীক ভাবে বেঁচে আছে। আর সেজন্যই বুঝি ঘৃণায় ঠাকুর্দা এ বাড়ির দখলি-স্বত্ব বজায় রেখে বালিগঞ্জে বাড়ি করে ছিলেন। পুজো-পার্বণে এখানে আসতেন শুধু পারিবারিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে। আর উল্টো হল আমার। আমি ভেবেছি, ঠাকুর্দা ভুল করেছিলেন। নিজেদের বাপ-ঠাকুর্দার ভিটেতে মাথা তুলে বাঁচবো। মাত্র দুটো বছরের ব্যবধানে বাবা-মাকে হারালাম। ভাবলাম রক্ত-সম্পর্কের মানুষজনদের নিয়ে জীবন কাটাব। নাহ্, বড় ভুল হয়ে গেছে।'

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বলি, 'ছাড়ুন তো ও সব। দরবারে কি জন্য তলব পড়েছিল?'

মৃদুলদার চেহারাই গেল পাল্টে। হাসি মুখে বলল, 'সে তুই ঘরে গিয়ে জানতে পারবি।'

ওখান থেকে চলে এলাম। ঘরে এসে দেখি বাবা-মা খুব খুশি।

মা আমাকে দেখে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বাবাকে লক্ষ করে বললেন, 'সবই এখন অরূপের ওপর নির্ভর করছে।'

বাবা বললেন, 'তা তো বটেই। তবে কী জান, মৃদুলের কথা অরূপ ঠেলতে পারবেনা।' আমি মনে মনে বললাম, অরূপ কারো জন্য না হোক, আমার জন্য আসবেই। দূর ছাই! সে রাতে আমার ভাল ঘুমই হ'ল না!

অরূপের কথা

মানুষ যা ভাবে তা যদি ঠিক ঠিক খেটে যেতো তো কথাই ছিল না। আমার মনে হয়, আমার ভাবনা কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে। গণ্ডীবদ্ধ জীবনের বাইরে যে একটা বিরাট জগৎ আছে, সেটা এক কালে আমাকে ভীষণ ভাবে আকর্ষণ করছিল। সেখানে স্বপ্নের চেয়ে বাস্তবের রূঢ়তাই বেশি। চতুর্দিক অশিক্ষা কুশিক্ষার জর্জরিত হয়ে আছে পরিবেশ, এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমি সীমাহীন ব্যাকুলতা অনুভব করতাম। প্রপিতামহ স্বর্গীয় তারাচরণ তর্কতীর্থ পুজো-আর্চা করে, ভাগবত পাঠ করে কায়ক্লেশে জীবন যাপন করেছেন। পিতামহও সেই সুনাম অক্ষুন্ন রেখে গেছেন। বাবাই যা ব্যতিক্রম। ইংরেজী শিক্ষায়-মাঝারি জ্ঞান অর্জন করে সরকারী চাকরী গ্রহণ করেছিলেন। বাবার ছিল বদলির চাকরী কিন্তু হলে হবে কী, আমার বাবাও সংস্কারের পলেস্তরা পুরোপুরি সরাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বাবা বলতেন, শিকড় যদি মাটির গভীরে চলে যায়, তবে সে গাছের ঝড়-বাদলায় ভয় থাকে না, ঠিক অটল অনড় হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেই চলে।

একথা সেদিনই বলেছিলেন, যেদিন আমি কী জানি কেন আমার ঠিকুজী জানতে চেয়েছিলাম। ভাদ্রমাসের দুর্যোগপূর্ণ কোন এক মঙ্গলবার আমার জন্ম হয়েছিল। একথা মা অনেক কষ্টে স্মৃতি ঘেঁটে বের করতে সক্ষম হন।

কিন্তু আমার বাবা সেটাও মনে করতে পারেন নি। অনেক ভাই-বোন আমার। সাকুল্যে এগারোজন সন্তান ছিল মুরারি মোহনের। আমি দশম সন্তান। শুধু প্রথম ও শেষ সন্তানের জন্মতারিখ ও সময় বাবার ছিল মুখস্থ।

আর সবই অস্পষ্ট ধূসর। স্বাভাবিক কারণেই অন্যদের বাবা-মার প্রতি অভিমান হওয়ার কথা। কিন্তু আমার হয় নি, এ ব্যাপারে নিজেকে সৌভাগ্য-বানই মনে করেছি। কেননা, জন্ম সন তারিখ, সময় জানা থাকলেই মনকে যতই হোক এড়াতে পারতাম না। কোনদিন না কোনদিন কোন এক জ্যোতিষীর দোরে হাজির হয়ে যেতাম। মানুষ বড় দুর্বল। রাশিচক্র মিলিয়ে, ঠিকুজী ঘেঁটে সে জ্যোতিষীর কাছে না যেয়ে পারে না। ডাক্তারের কাছে রোগীই যায় আর জ্যোতিষীর কাছে যায় হতভাগ্যরাই বেশি। মোক্ষম দাঁও মেরেও বসে সেই তালে জ্যোতিষীরা। গাছ-গাছালির মূল নয়তো বা পাথর ধারণ করার প্রেসক্রিপশন দিয়ে বলে, গাছ-গাছালির মূল দিন দশ-পনেরো অন্তর পাল্টান দরকার, তার থেকে স্থায়ী পাথর ধারণ করাই হবে বেশি কার্যকরী। দুঃখের বোঝা আরও বেড়ে যায়। সে ওটাকেই ধ্রুব সত্য মনে করে, যে করেই হোক দামী পাথর জ্যোতিষীরই বলে দেওয়া দোকান থেকে কিনেও ফেলে।

মৃদুল একদিন হঠাৎই জিজ্ঞেস করল 'তোমার ঠিকুজীটা একবার দিও তো, অমুক জ্যোতিষ সম্রাটের কাছ থেকে তোমার ভবিষ্যৎটা জেনে নেবো।'

ওর কথায় খুব হেসেছিলাম সেদিন। বলেছিলাম, 'আমি হচ্ছি বেনো জল, এর আবার ভূত ভবিষ্যৎ কী থাকবে?'

'কেন থাকবে না? আর কেনই বা তুমি নিজেকে বেনোজল ভাবো?'

ওকে আরও রহস্যের মধ্যে রাখার জন্য বলেছিলাম, 'কেন, ভাবলে দোষ কী? আর এজন্যই আমি বাবা-মা'র কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ।'

সামান্য সময় থেমে মৃদুলকে লক্ষ করে বলি, 'আমি কিন্তু তোমার সম্বন্ধে তিনটে কথা বলতে পারি।'

মৃদুলের স্বভাবে কৌতূহল তীব্র। পাল্টা জিজ্ঞেস করেছিল ও, 'কী কী বলই না?'

গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিলাম, 'সময়টা তোমার ভাল নেই, আট-দশ বছর বয়সের সময় তুমি মরণাপন্ন হয়েছিলে. আর আগামী বছরের গোড়া থেকেই তুমি সু-দিনের মুখ দেখবে।'

মৃদুল চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। পরে বলল 'প্রথম দুটো মিলল, পরেরটা মিলল না।'

'কেন?'

'কেননা, আমার জীবনে দুর্দিন বলে কিছু নেই।'

এত বিশ্বাস তোমার ?'

'আলবাৎ'।

কিন্তু আজ ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলাম যখন তখন কেন যেন, সেদিনের সেই কথাটা আজ বড় বেশি সত্য হতে চলেছে বলে মনে হ'ল আমার।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় যেমন মানুষের ক্ষত বিক্ষত চেহারা হয়, মৃদুলকে আমি তাই চাক্ষুষ করেছিলাম। ভয় বস্তুটি আমার জীবনের অভিধানে নেই। কিন্তু কেন যেন আজ ওর জন্য ভয় আমাকে ভীষণ অস্থির করে তুলল। এর একটা হেস্তনেস্ত দিক না দেখে আমার পরিত্রাণ নেই বুঝি। সেটা ভবিষ্যতের জন্য আপাতত তোলা থাক।

বাবাদের আমলটা ছিল বড় বেশি মন্থর। বর্তমানের মত একেবারেই নয়। কিছু একটা করা উচিত মনে করেই দেবুদার শরণাপন্ন হই। কেননা, দেবুদা মার্কসবাদের যুক্তি দিয়ে অনেককেই কাছে টানছিলেন। চতুর্দিকের আবর্জনা দূর করে মানুষকে মনুষ্যত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ওঁর জীবন-সাধনা। আর সে জন্যই দেবুদা নাইট স্কুল খুলেছিলেন, করেছিলেন বয়স্ক নর-নারীর শিক্ষার ব্যবস্থা। আর সেটাই হল কাল। যাদের কলমের খোঁচায় অর্থ সাহায্য আসতে লাগল, ওরা দেবুদার গড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ওই সব বিশেষ রাজনীতি করা লোকজনকে ঢোকাতে লাগল। দেবুদাকে সে সবই মুখ বুজে সহ্য করতে হল। পরিণতি স্বরূপ বিরুদ্ধ বাদীরা দেবুদার বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'ল এবং নোংরা কাদাঘাঁটা শুরু করে দিল।

ক্ষমাদি ছিলেন দেবুদার সঙ্গী। সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিতা মহিলা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ ডিগ্রী ছিল ক্ষমাদির। স্বামীর ঘর করতে পারেন নি, কেননা স্বামীটি ছিলেন ব্যভিচারী, দুর্নীতিপরায়ণ। মাস ছয়েকের মধ্যেই ডিভোর্স পেয়ে যান ক্ষমাদি। লোকটির কাছ থেকে খোর-পোষ আদায় করতে পারতেন, কিন্তু যাকে তিনি ঘৃণা করেন তারই উপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ করেছিলেন এবং বেঁচে থাকার মধ্যে যে সুখ ও আনন্দ আছে, তা পাওয়ার জন্যেই দেবুদার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে যান ক্ষমাদি।

বিরুদ্ধবাদীরা বলতে লাগল, 'ব্যভিচারী দেবু ঘোষ দূর হটো।'

রাজনীতির কুটীলতার তিক্ততায় মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল দেবুদার।

ওদের মুখ বন্ধ করার জন্য ক্ষমাদিকে বিয়ে করলেন দেবুদা।

আর অমনি বিরুদ্ধবাদীরা পাল্টা স্লোগান দিতে লাগল, 'সুযোগের অপেক্ষায় ছিল কে ? দেবু ঘোষ আবার কে।'

ক্ষমাদিকে কোনদিনই ম্রিয়মান দেখিনি। দেবুদার পরিশ্রম পণ্ড হচ্ছে দেখে এ পাড়া ছেড়ে তেঘরিয়ায় বাসা ভাড়া করলেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। নোংরা ঘাঁটা মানুষগুলো সব যেন নেড়ি কুত্তার মত। দেবুদাকে নাগালে না পেয়ে, ওরা এবার কোমর বেঁধে আমাদের বিরুদ্ধেই নানান ধরণের ফন্দি ফিকির করে জল ঘোলা করে তুলতে লাগল। পরেশ ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে, লোহার মত শক্ত শরীর, গায়ে অসম্ভব শক্তি। দু'একদিন কিছুই করল না ও, শেষে যেদিন ওরা আমাদেরই সরাসরি আক্রমণ করে বসল এই বলে, 'মৌচাক ভেঙে গেছে। মধু নেই জেনে তোরা সব শুকিয়ে হাড্ডিসার হয়ে যাচ্ছিস। বড় দুঃখু হয় তোদের দেখেরে, তোদের গুরু মধু খাচ্ছে চাকুম-চুকুম, আর তোরা ব্যাঙের মত চিৎ হয়ে পড়ে আছিস, এ দশা তোদের আর দেখতে পাচ্ছি না রে।'

যেই না বলা, পরেশ একাই ওদের মোকাবিলা করল প্রচণ্ড ভাবে। কারো নাক ভাঙলো, কারো কষ বেয়ে রক্ত পড়লো, কারো বা কপাল জুড়ে বড় আব দেখা গেল। ওরও যে লাগে নি তা নয়, কি কঠিন কঠোর মনোবল ওর। আমরা সকলে মিলে ওকে সামলালাম। কিন্তু এর পরিণতি যে, অনেক দূর গড়াতে পারে সেটা পরেশ কেন আমাদের কারো মাথাতেই আসে নি।

রাজনীতির দাদাদের নিয়ে বিরাট মিছিল বেরোল আমাদের বিরুদ্ধে। সকলেই আমাদের কালো হাত ভেঙে দেবার জন্য গর্জাচ্ছিল। এরই মধ্যে পুলিশ এসে আমাদের ধরে নিয়ে গেল। পরেশ বোধ হয় কিছুটা আঁচ পেয়ে থাকবে, ও গা ঢাকা দিল অদ্ভুতভাবে। এ বাড়ির ও বাড়ির ছাদ টপকে কোথায় যে ও উধাও হয়ে গেল, আমরা তার কিছুই কিনারা করতে পারলাম না। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে, আমাদের পেছনে যারা লাগত, তাদের সকলকেই পাড়ার লোক চেনে। পাড়ার নামী মেয়ে স্কুলের সামনে ওদের যত ব্যস্ততার বহর। ঠিক সাড়ে দশটা থেকে ওদের তৎপরতা বাড়ে আবার চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ঘুম চোখে ওরা এ গলি ও গলির মোড়ে কেষ্ট ঠাকুর সেজে দাঁড়িয়ে মেয়েদের সম্পর্কে নানান ধরণের অশ্লীল মন্তব্য আর অঙ্গ ভঙ্গি করে। শুনেছি, এদের উৎপাতের হাত থেকে দিদিমনিরাও বাদ যেতেন না। আশ্চর্য ব্যাপার, রুখে দাঁড়াবার মত মানুষের সংখ্যা নেই-ই বলতে গেলে।

দেবুদা যতদিন এ পাড়ায় ছিলেন, ওদের উপদ্রব এত ছিল না। কেন যেন, দেবুদাকে দেখলেই ওরা সরে পড়তো।

আমাদের ওয়ার্ডের এম. এল-এ মধুসূদন রায় এ পাড়াতেই থাকেন। দেবুদা বার কয়েক মধুবাবুকে এ সম্পর্কে নালিশ জানিয়েছিলেন।

মধু বাবু সব সময়ই বলতেন, 'এই সব ফ্রাসট্রেটেড ছেলে-পুলে নিয়েই হয়েছে যত জ্বালা। ঠিক আছে আপনি জানালেন, আমার সহকর্মীদের এ বিষয়ে নজর রাখতে বলবো। ঠিকই তো, পাড়ার সুনাম এতে নষ্ট হয়, মা-বোনের সম্মান যদি আমরা না দেখি তো কে দেখবে বলুন ?'

যে সময় দেবুদা এ বিষয়ে নালিশ করেছিলেন মধুবাবুর কাছে তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মধুবাবুর দলবল দেবুদার বিরুদ্ধে গুজগুজ ফুসফুস শুরু করে দিয়েছিল। এটা দেবুদা বা আমরা ঠিক তেমন বুঝতে পারি নি। মধুবাবুর সম্পর্কে বিশ্বাস হারাবার কোন কারণই ছিল না, কেন না, পরাধীন ভারতের মুক্তি আন্দোলনে উনি বার কয়েক কারাবরণ করেছিলেন। সেই মানুষকে অবিশ্বাস করি কী ভাবে ? কিন্তু এর পরিণতি হলো উল্টো। দেবুদার আধিপত্য বেড়ে যাচ্ছে এটা কোনভাবেই মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না বরং এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ক্ষমাদিকে কেন্দ্র করে দেবুদাকে কালিমা-লিপ্ত করাই হল মধুবাবু গোষ্ঠীর প্রধান কাজ। যাই হোক, পরেশকে পুলিশ ধরতে পারল না।

আমরা জনাকয়েক পুলিশের অতিথি হয়ে গেলাম। এরই মাঝে, কারো বাবা-কাকা পুলিশের কাছে গিয়ে ব্যক্তিগত জামিনে নিজের নিজের ছেলেদের ছাড়িয়ে নিয়ে এলো। এদের মধ্যে সুনন্দ ভাদুড়ী ছিল। ও বেরিয়ে আসার সময় শুধু ফ্যাকাশে হেসে বলে গিয়েছিল, 'ভাবিস না, তোদেরকেও ছাড়াবার ব্যবস্থা করছি।' শুধু দেবুদা ছাড়া আর কেউ আসেনি আমাদের জন্য। কিন্তু দেবুদা থানায় এসে বুঝতে পেরে গেলেন, তার দিন শেষ। আমাদের থানা থেকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে হাজির করান হল। আমি কোর্টের খাঁচাতে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেলাম এই শুনে যে, আমরা ইভটিজার্স, এ ছাড়াও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নাকি পাড়ায় সন্ত্রাস চালাই, গয়লা পাড়ার বস্তিতে আমরাই নাকি গত সপ্তাহে মধ্যরাতে বোমবাজী করেছি, আগুন লাগাবার চেষ্টা করেছি। শুনে হতভম্ব হওয়া ছাড়া কোন পথই আমাদের ছিল না।

আমরা যে নির্দোষ সে কথা কোর্টে সোচ্চারে ঘোষণা করলাম। কিন্তু কিছুই হবার নয়। সর্ষের মধ্যে যদি ভূত থাকে, তবে ভূত ছাড়ানো বড় মুস্কিল।

কিন্তু পরেশ চুপচাপ থাকার ছেলে ছিল না। ওই একদিন গোপনে মৃদুলকে সব জানাল। মৃদুলের ও বাড়ির এক কাকা সব শুনলেন ধৈর্য ধরে।

পরেশকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মারধোর তাহ'লে তুমিই করেছ ?'

'হ্যাঁ।'

মৃদুলের কাকা রঘুনাথ মুখুজ্জে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পরেশের স্বীকারোক্তিতে। বলেছিলেন 'বেশ করেছ, হারামজাদাগুলোকে, আরও ঘা কয়েক দেওয়া উচিত ছিল।'

যাই হোক মৃদুলের কাকা সেদিনই নাকি মধুবাবুর ওখানে গিয়েছিলেন। কী কথা হয়েছিল তা জানি না। তবে, পরের তারিখেই আমরা সকলে বেকসুর খালাস পেয়ে গেলাম। যারা ঠাট্টা ইয়ার্কি করতো, তারা বড় বেশি নির্জীব হয়ে পড়ল। খবর পেয়ে পরেশও বুক ফুলিয়ে পাড়া মাতিয়ে ঘুরে বেড়াল। এবং জোর গলায় সকলকে জানান দিল সকাল সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা এবং বিকেল চারটে থেকে সাড়ে চারটের সময় যদি কাউকে এখানে-ওখানে উঁকি-ঝুঁকি মারতে দেখে তো, মুখের জিওগ্রাফী পাল্টে দেবে।

সকলেই বেশ সুবোধ বালক হয়ে গেল, এটাই ছিল আমাদের ভুল, দেবুদার ভুল।

নাইট স্কুলটা দিনে সিফট্ হয়ে জুনিয়ার হাই-এ পরিণত হল। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বলে, বড় করে সাইন বোর্ড ঝুলল আর দলে দলে মধু বাবুর ছেলেরা স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়ে গেল। দেবুদার অস্তিত্ব একেবারেই খর্ব হয়ে গেল। কেননা কোয়ালিফিকেশানের দৌড়ে দেবুদার হার হল। এর পরই পাখা কাটা হ'ল ক্ষমাদির। সে বড় অশ্লীল আর কদর্য ঘটনা ঘটিয়ে।

দেবুদাকে অনেকদিন দেখি না। আজ সকাল থেকেই দেবুদার কাছে যাব ঠিক করলাম। ঠিক সেই সময় মৃদুল এসে হাজির। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার মৃদুল, এত সকালে যে ?'

'তুমিই তো বলেছ উত্তেজনা কমলে চলে আসতে, তাই চলে এলাম।'

'বেশ করেছ, তোমাকে পেয়ে ভালই হল। দেবুদাকে দেখতে যাবে নাকি ?'

'এখনও ভোলনি দেখছি তোমার আদর্শ পুরুষকে ?'

'আদর্শ পুরুষ বলেই তো ভুলতে পারছি না মৃদুল।' আমি উত্তর দিই।

মৃদুল স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'প্রলেতারিয়েত না কি যেন বল তোমরা, সে' আমার ধাতে সয় না। আমাকে তুমি ওসবের মধ্যে জড়িয়ো না।'

'এত ভয় কিসের ?'

মৃদুল উত্তর দেয়, 'ভয় নয় অরূপ। নিজেকে কেন জানি না ভীষণ ছোট

মনে হয়।'

'এতো হীনমন্যতার লক্ষণ মৃদুল ?'

'এর জন্য দায়ী ব্লু-ব্লাড।' বলেই বেশ দরাজ ভঙ্গিতে হাসে মৃদুল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলি, 'আজ তোমার কোন কথাই শুনবো না। তোমাকে নিয়ে তেঘরিয়ায় আমি যাবই যাব।'

'তেঘরিয়া? সেটা আবার কোথায় ?'

'ওপার বাংলার কত লোক, কত জায়গায় বসতি গেড়েছে, লড়াই করে বেঁচে আছে, তা কি একদমই জান না নাকি ?'

মৃদুল বলে, 'ও সবই তো জবর দখল জায়গা।'

'তাতে কী যায় আসে। অঢেল জায়গা পড়ে থাকবে অথচ মানুষ সেখানে বাসা বেঁধে জীবন কাটাবে না কেন ?'

মৃদুল বলে, 'বেআইনি।'

'আইনি কোনটা ? ওই যে আমাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ওটা কী তবে আইন মাফিক হয়েছিল, না, ব্যক্তিগত ফয়দা লোটার উদ্দেশ্যেই হয়েছিল, তা কী এখনও তোমার অজানা ?'

মৃদুল উত্তর দেয় 'সে জন্যই তো পলিটিক্যাল লোকদের আমি পছন্দ করি না।'

'তুমি তো কাউকেই দেখতে পার না।'

'কেন তোমাকে ?'

'সে তোমার আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব।'

স্থির চোখে মৃদুল আমাকে দেখে বলে, 'বেশ যাব তোমার সঙ্গে।'

কি যেন হয়ে যায় আমার মধ্যে। ওকে জড়িয়ে ধরে বলি, 'জানতাম তুমি না করতে পারবে না।'

মৃদুল সহাস্যে বলল, 'একজন যে তোমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে। সে খবর কী রাখ ?'

'কী বলছ যা-তা। আমি সামান্য মানুষ, সে সৌভাগ্য কোনদিনই আমার হবে না।'

হো হো করে হেসে ফেলি ওর কথায়। বলি, 'আমরা মুখে কত বড় বড় কথাই না বলি কিন্তু আসলে পারি কী ?'

মৃদুল বিস্মিত ভঙ্গিতে চেয়ে বলে,' তা'হলে, এতকাল যেসব কথা বলতে

তার কি কোনই অর্থ নেই?'

'হেঁয়ালি করে তুমিও তো অনেক কথাই বলো। বলো না?'

'হ্যাঁ বলি।'

'আমারটাও ধরে নাও সেরকমই। তোমার বন্ধু পরেশের বার্ন কম্পানীতে চাকরি হয়েছে?' মৃদুল বলল।

আমি হেসে বললাম, 'ভালই হল।'

মৃদুল হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল, মুখুজ্জে বংশের গোঁড়ামির বেড়ায় লাথি মারবো প্রতিজ্ঞা করেছি। তোমাকে দিয়ে আমি সেই অসাধ্য সাধন করবো।'

আমি বলি, 'পুরোহিত বংশের ছেলেকে দিয়ে কী ও কাজ তুমি পারবে মৃদুল?'

মৃদুল বলে, 'রোগী যদি নিজেই বাঁচার আশা ছেড়ে দেয় তো পৃথিবীর কোন ব্যক্তির সাধ্য নেই যে, তাকে বাঁচায়। তোমার অবস্থাও দেখছি তাই। আমি লিয়াজোঁতে ওস্তাদ। মিঠুর লেখাপড়ার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। দর্শনে অনার্স পড়েছে। তুমি ছাড়া ওকে সত্য দর্শন করাবে কে?' আমার সে কথা শুনে সমস্ত শরীর হিম হয়ে যায়। গতকালের মিঠুর সঙ্গে সব কথা ছায়াছবির মত এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। মিঠু বলেছিল,' 'সব কিছু প্রকাশ হলে রহস্য থাকে না।' আবার এ-ও বলেছিল, 'সময় সুযোগ পেলে জানতে পারবেন আমি বেঁচে আছি কী না,' কথাগুলো মনের মধ্যে প্রবল ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দিলেও মৃদু হেসে বললাম, 'এ যে বড় গুরুদায়িত্ব মৃদুল?'

'জানি তবু তোমাকেই হতে হবে প্রধান পুরোহিত।'

মৃদুল কি এ সব জেনে শুনে বলছে, না, আবেগ বশে বলছে ঠিক ধরতে পারি না। তাই বাজিয়ে দেখার উদ্দেশ্যেই বললাম, 'যদি কখনও ভুল করে বসি, তুমি সেটা সইতে পারবে তো?'

মৃদুল অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। বলে, 'ভুল তো হতেই পারে। চেষ্টা করলে পারলে না, তাতে দোষের কিছু দেখি না। হাত-পা গুটোন মানুষগুলোকে আমি দুচক্ষেও দেখতে পারি না। আজ তাহ'লে তেঘরিয়ায় যাওয়া বন্ধ রাখ। মুখুজ্জে বাড়ির হাওয়া একটু গায়ে লাগাও না?'

আমি হেসে বলি, 'ও হাওয়া তো অনেকই লেগেছে। কথা দিচ্ছি, আগামী

কাল নিশ্চয়ই যাব তার আগে আমার আদর্শ মানুষটির দাম্পত্য জীবনটাকে একটু চাক্ষুষ করতে চাই মৃদুল।'

মৃদুল বলে, 'বেশ তো আছে ওরা। থাক না নিজেদের মতন করে বেঁচে। হঠাৎ তোমাকে দেখে যদি ফের ঝড়ো হাওয়ায় ওরা বেসামাল হন, তখন কিন্তু দুঃখের শেষ থাকবে না!'

আমিও নাছোড়বান্দা কম নই। বলি 'অত দুর্বল ভাবছ কেন মানুষটাকে। দূর থেকে অনেক কিছুই আমরা ধারণা করি, সেটা মনে হয় ভুল। কাছে গিয়ে পরখ করতে হয়। দেখিই না কী হয়।'

মৃদুল কথা বাড়ায় না। মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। বলে, 'বড় মুখকরে মিঠুকে বলেছি আজ তোমাকে নিয়ে যাবই সেটা তুমি গোয়ার্তুমি করে হতে দিলে না।'

আমি মৃদুলকে উপলব্ধি করতে পারি। বলি, 'একটা রাতের তো ব্যবধান। অত মুষড়ে পড়ছো কেন? ঠিক চারটেতে আমরা বেরুবো। ছ'টা নাগাদ ফিরে এসে যদি সময় পাই তো তখন না হয় যাব। কী বলো?'

মৃদুল হেসে ফেলল সে কথায়। বলল, 'বেশ ও কথাই রইল।' কথা শেষ করেই ও চলে গেল।

তেঘরিয়াতে আমরা এসে যখন পৌঁছুলাম তখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে প্রায়। সকলেরই ঘরে ফেরার তাড়া। পাখ-পাখালিরাও ঘরে ফিরছে। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মিনিট পনেরো হেঁটে অর্জুনপুর। অধিকাংশ কাঁচা বাড়ির মাঝে দু-একটা পাকা বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সাইকেল আর রিক্সার ব্যস্ততা খুবই। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে দেবুদার বাড়ির দেখা পেলাম।

মৃদুল বলল, 'এ এক গ্রাণ্ড এক্সপেরিয়েন্স অরূপ। কলকাতাকেই বাংলাদেশ বলে ভুল করেছি এতকাল। মানুষগুলো কেমন সরল, সহজ, তাই না?'

আমি বলি, 'বাইরে মধুবাবুও খুব সুন্দর, তোমাদের বাড়ির লোকজনও।'

মৃদুল হ্যাঁ-না কোন উত্তরই দেয় না।

আমাদের আসতে দেখেই ক্ষমাদি ছুটে এলেন। আমাকে অপলকে দেখে বললেন 'ভুলিসনি তাহ'লে আমাদের?'

'কী যে বলনা ক্ষমাদি। বলেই নজর করি দোলনায় শোয়ান ফুটফুটে এক বাচ্চাকে।

ক্ষমাদি বলেন, 'আমাদের সন্তান। জ্যোতির্ময়।'

'দেবুদাকে দেখছিনা ?'

ক্ষমাদি হেসে ফেলেন। 'ও এখন ঘোরতর সংসারী, একটা ওষুধ কম্পানীর সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ। বর্তমানে কটকে গেছে।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে আসে, 'ইস্। কত আশা নিয়ে এসেছিলাম, দেবুদার সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করবো বলে।'

ক্ষমাদি সে কথায় গুরুত্ব না দিয়ে মৃদুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো মুখুজ্জে বাড়ির ছেলে। কী যেন নাম তোমার ?'

'মৃদুল মুখার্জী।'

'ও হ্যাঁ।' ভুরু কুঁচকে কী যেন ভেবে বললেন, তোমরা কী এখনও বালিগঞ্জে থাক।'

'থাকতাম। এখন ফের আদি বাড়িতেই ঠাঁই গেড়েছি।'

'ভালই করেছ। আমারও খুব ইচ্ছে হয় ও পাড়ায় ফিরে যেতে। কিছুই নেই, তবু মনে হয় কত কী আছে। ভেতরে এসে বসো।' ক্ষমাদি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েন আমাদের জন্য। 'কী খাবে বলো ?'

'শুধু বাতাসা জল, নয়তো শুধু চা।'

'ধুস, সে কি হয়। এতদিন পর এলি বন্ধুকে নিয়ে, তোদের দেবুদা থাকলে আজ খুব ভাল হত। তোদের সারারাত আটকে রেখে দিত হয়তো।'

'সেটা কি আপনি পারেন না ?'

ক্ষমাদি করুণ মুখ করে বলেন, 'সে জোর নেই।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ক্ষমাদি ?'

'একটা কেন দশটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারিস। কি জিজ্ঞেস করবি তা আমি জানি।'

'বলুন তা হ'লে ?'

'ত্রিদিব শ্যামল, মলয়রা যখন স্ক্যাণ্ডাল রটালো, তখন তোদের দেবুদা একেবারেই ভেঙে পড়েছিলেন। আমি সব হতাশায় অবসান ঘটাই। বিশ্বাস কর, একটা দিনের জন্যও ওঁর প্রতি দুর্বলতা আমার ছিলনা। কিন্তু যখন দেখলাম রাজনীতির কুৎসিৎ চেহারা, তখন এক মুহূর্তেই আমিও ভীষণ জেদি হয়ে উঠলাম। ওকে বোঝালাম। মানসিক ভারসাম্য প্রায় হারিয়েই ফেলেছিল ও। ধীরে ধীরে শান্ত হল। একরাশ অভিমানকে সম্বল করে আমাকে রেজিস্ট্রি করে এখানে চলে এল। এখন খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়েনা। ভাবি, ভুল

করলাম না তো ?'

জিজ্ঞেস করলাম 'আপনারা কি সুখী ?'

'জানিনা।' বলেই গাঢ় করে শ্বাস ফেললেন ক্ষমাদি। 'তোরা সব ভাল আছিস? ওই স্কুলটা কেমন চলছে রে ?'

আমি বিস্মিত, হতবাক। এতগুলো দিনের মধ্যে ক্ষমাদিরা একবারও ওখানে যাননি ভেবে।'

ক্ষমাদি জিজ্ঞেস করেন, 'কেউ-ই আর আমাদের কথা বলে না, না ?'

'সকলের কথা বলতে পারবো না, তবে আমি মনে রেখেছি আপনাদের।'

'কেন মনে রেখেছিস। যত শিগ্‌গির পারিস ভুলে যা।' অসম্ভব ঋজু ভঙ্গিতে বললেন কথাগুলো ক্ষমাদি।

'ভুলে যাব ?'

'ভুলে যাওয়ার থেকে সুখ আর কি আছে বল ? এবার ক্ষমাদির গলা থমথম করে।

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যই মৃদুল বলে, 'আমাদের খিদে পেয়েছে ক্ষমাদি. কিছু খাওয়ান।'

ভীষণ লজ্জায় পড়ে যান ক্ষমাদি। বলেন, 'একটু বোস। ছেলেটাকে একটু নজরে রাখিস।' বলেই ভেতর ঘরে চলে গিয়ে ফের বাইরে বেরিয়ে পড়েন ক্ষমাদি।'

মনে মনে ভাবি, ক্ষমাদি কত পাল্টে গেছেন। কোথায় সেই সংগ্রামী চেহারা। সেই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী ক্ষমাদি যেন সংসারের জটিল আবর্তে কেমন কৃশকায়, সাধারণের দলে ভিড়ে গেলেন। অথচ, একদিন ক্ষমাদিকে আর সকলের থেকেই পৃথক করে রাখা যেত। চোখ ধাঁধান ভঙ্গী ছিল ক্ষমাদির।

মৃদুল বলল, 'তুমি এত নির্বোধ কেন ?'

'নির্বুদ্ধিতার কি পরিচয় পেলে মৃদুল ?'

'সুখী কিনা তা কি ঘরের চেহারা দেখেও বুঝতে পারনা। ভরাট সংসার নিয়েই তো মানুষ থাকে!'

'ব্যতিক্রমও কি নেই বলতে চাও ?'

'হয় তো আছে।

খুব কৌতূহলী হয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে থমকে যাই। দেয়াল জুড়ে রয়েছে বেশ কয়েক জন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির ছবি। মার্কস, রবীন্দ্রনাথ, চৈতন্যদেব,

শ্রীরামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দ। কি আশ্চর্য সহাবস্থান ঘটিয়েছেন দেবুদা। সব চেয়ে বিস্মিত হলাম মহাত্মা গান্ধীর ছবি দেখে।

ক্ষমাদি তেলেভাজা আর মুড়ি নিয়ে এলেন। একটা থালায় মুড়ি ঢেলে তেলেভাজা গুলোকে মুড়ির ওপর ছড়িয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'মনে আছে তো অরূপ, আমরা এক সময় এ' রকম ভাবেই ভাগ করে খেতাম।'

'হ্যাঁ সব মনে আছে ক্ষমাদি। মুড়ি চিবোতে চিবোতে বললাম, 'এখন ওসব একদম উঠে গেছে।'

'হ্যাঁ। আত্মসর্বস্ব মানুষের হতাশাও তাই বাড়ছে দিন দিন।' কথা শেষ করেই ক্ষমাদি চা করতে চলে গেলেন। আমরা বাইরে থেকে স্টোভের অওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

চা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় নামলাম যখন, তখন ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

ক্ষমাদি শুধু বললেন, সাবধানে যাস তোরা। পারিস তো সামনের সপ্তাহে-একবার আসিস।'

মৃদুল বলল, 'এখন গলা ছেড়ে ওই গানটা গাইতে ইচ্ছে করছে রে?'

'কোন গানটা?'

'দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না। গাইব।'

'গা না।'

গলা ছেড়ে নয়, গুনগুন করে গাইতে গাইতে আমরা বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছিলাম। জানালার পাশে বসে হঠাৎ মন খুশির হাওয়ায় ঝলসে উঠল। মৃদুলকে বললাম, 'কেমন লাগল মৃদুল?'

'ওয়াণ্ডারফুল। আমাকে আবার আসতে হবে। এটা কেন যেন মন বলছে।'

বাসটা সে সময় প্রচণ্ড গতিতে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে হু হু করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

চার, কাকীমার কথা

আমার এত রূপ না থাকলেই ভাল হ'ত। এটা অবশ্য আমার কথা, একান্তই একপেশে। বাবা-মার কাছে আমার রূপ যৌবন অসম্ভব গর্বের। আত্মীয় স্বজনদের কাছে আমি ছিলাম হিংসার পাত্রী, আর পাড়া প্রতিবেশিদের কাছে স্নেহের। লেখাপড়ায় দাদার মত না হলেও, পরীক্ষায় পাশ করেছি সহজেই,

হিমাদ্রিকে রোজই-দেখতে যাই, সঙ্কোচ বা দ্বিধা কিছুই ছিল না এ ক্ষেত্রে। অন্য মেয়ে হলে কী হ'তো কে জানে, আমার ক্ষেত্রে কিন্তু কোন সোর গোল বা কথা চালাচালি হল না। আর-এও জানি, এসবই সম্ভব হয়েছিল মা'র জন্য।

মা একদিন বলা নেই কওয়া নেই হুট করে কলকাতায় দাদার মেস বাড়িতে চলে গেলেন। দু' দণ্ড আগেও আমরা কেউ-ই মা'র কলকাতা যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। বাবাকে সব সময়ই প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা নিতে দেখেছি। আশ্চর্য মানুষ বাবা। মা'র প্রতি বাবার এত প্রগাঢ় বিশ্বাস কী করে জন্মাল ভেবে পাই না।

মা বিকেল পেরিয়ে গেলে বেশ থমথমে মুখে বাড়ি ফেরেন, আমরা সকলেই বড় বেশি তটস্থ হয়ে পড়ি।

বাবা প্রসন্ন মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামাকে কেমন দেখলে?'

'ভালই তো।' মা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন।

'তাহলে মুখখানা অমন করে রয়েছ কেন?'

মা হেঁয়ালি করার মত করে বললেন, 'বড় বাঁচা বাঁচালে। ক'দিন আমাকে ভাল করে দেখেছ?'

'রোজই দেখি তুমি টের পাও না।'

সে কথায় মা উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে হাসতে থাকেন।

'কই বললে না তো শ্যামা কেমন আছে?'

'বললাম তো ভালই।

'উঁহুঁ, ওটা জবাব হল না। কেমন যেন ঝাঁঝ রয়েছে, বাবা স্মিত হেসে বলেন।

আমি পাশের ঘর থেকে সবই শুনি। পেছন ফিরে বসে থাকার ফলে মা'র মুখ ভাল করে নজরে আসে না কিন্তু বাবাকে স্পষ্ট দেখতে পাই।

মা বলেন, 'চারুকে নিয়ে ভাবনায় পড়েছি।'

'কেন? কিসের ভাবনা।'

'ভদ্রেশ্বরের বাড়িতেও গিয়েছিলাম।'

বাবা বিস্মিত ভঙ্গিতে বলেন, 'এ তো প্রায় অসম্ভব কাজ করেছ।'

'করতে হ'ল।' মা ভাবলেশহীন মুখে জবাব দিলেন।

'এত পরিশ্রম তোমার কি সইবে?'

'না করেও তো উপায় নেই।'

'আমার ওপরে তোমার কোন্ বিশ্বাস নেই নাকি ?' বাবা প্রশ্ন করেন।

মা অমনি বাধা দিয়ে বলেন, 'তোমাকে বিশ্বাস না করলে নরকেও ঠাঁই হবে না আমার।'

খুব খুশি খুশি গলায় বাবা বলেন, 'যদিও গোঁড়া বংশে আমার জন্ম. তবুও ওই গোঁড়ামিটা আমার একদম নেই। আমি নরক বিশ্বাস করি না।'

মা হাসতে হাসতে বলেন, 'পণ্ডিত বংশে জন্মে নরক বিশ্বাস কর না. সে কী হয় ?'

বাবা সহজ হয়ে উত্তর দেন, 'সেটা তো আমিও ভাবি। এটা ভাল কী মন্দ তা জানি না, তবে এর জন্য তুমিই দায়ী।' বলেই বাবা হাসতে থাকেন।'
সে সময় সাময়িক মা-বাবাতে কোন, কথাই হয় না। হঠাৎ বাবা প্রশ্ন করেন 'চারুর কথা কী যেন বলছিলে ?'

'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েই বাবার দিকে শুকনো মুখ করে মা বলেন,' 'চারু এই সবে সতেরো পেরিয়ে আঠারোতে পড়ল, দাদারা এরই মধ্যেওর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন।'

'ভালই তো' আমিও চাই ওর তাড়াতাড়ি বিয়ে হোক।

মা বলেন, 'কিন্তু আমি যে চাই না।'

'তাহ'লে তো সব মিটেই গেল।'

'কেন চাইনা, জানতে চাইবে না।' মা প্রশ্ন করেন।

'কি হবে মিছিমিছি কথা বাড়িয়ে।'

মা দুঃখী মানুষের মত মুখকরে বলেন, 'উপর থেকে মানুষকে যতই প্রগতিশীল দেখাক না কেন আসলে তোমরা পুরুষেরা কিন্তু ভীষণ রকম ভাবে প্রাচীনপন্থী।' বাবা অবাক চোখে চেয়ে বলেন, 'তোমার কথার আগামুড়ো কিছুই ধরতে পারছিনা। একটু স্পষ্ট করে বললেই. সব সমাস্যার সমাধান হয়ে যায়.'

মা হেসে বলেন, 'ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও আমার দাদারাও কিন্তু··· কথা শেষ করতে দেন না বাবা। বলেন, ওঁরা বিচক্ষণ, বুদ্ধিমানও। যুগের হাওয়া কেমন তা নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন।'

মা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, বলেন, 'মিথ্যে কথা। মেয়েদের তোমরা ভোগ্য সামগ্রী ছাড়া কিছুই ভাবনা। আসলে স্ত্রীরা স্বাধীনচেতা হলে, তোমাদের যে অজস্র বিপদ।'

বাবা করুণ গলা করে বলেন 'মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছো।. কখনও

কী আমি তোমার স্বাধীনতা বা রুচিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি।'

মা বলেন, 'এ সংসারটাকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে দাদাদের শরণাপন্ন থাকতেই হয়। প্রতি মাসে আমি তিন চারশো টাকা ওঁদের কাছ থেকে নিয়ে আসি, তুমি সবই জান, অথচ না জানার ভান কর।'

'কী বললে হেম আমি তোমার সঙ্গে ভান করি?

মা বিচলিত হন মুহূর্তে। কেননা বাবার কথার মধ্যে ক্ষেদ দুঃখ বা রাগ আছে তা বুঝি মা টের পান। অনুতপ্ত গলায় বলেন, 'আমাকে তুমি ভুল বুঝো না।'

বাবা হেসে উত্তর দেন 'এ কি বলছো তুমি? এতগুলো বছর তোমার সঙ্গে ঘর করছি তোমাকে চিনতে আমার একটুও বাকী নেই। সত্যিই বলছি, আমিও চাইনা চারুর এখনই বিয়ে হোক। শ্যামাচরণ নিজের পায়ে দাঁড়াক। চারুও ইতিমধ্যে আরও পরিণত হবে, তখন সব কিছু বিচার করে ধুমধাম করে চারুর বিয়ে দেবো।'

মা'র মুখে হাসি উপছে পড়ে দেখতে পাই।

আমি বাবা ও মা'র মনের কথা জানতে পেরে নিজেকে পরম সৌভাগ্যবতী মনে করতে থাকি।

ঠিক সে সময় বাবা প্রশ্ন করেন 'শ্যামাচরণকে কেমন দেখলে?'

'ভালনয়।' মা'র গলা থমথমে।

'কেন? কি হয়েছে ওর? বাবার উৎকণ্ঠা মেশান গলা।

মা ফ্যাকাশে হেসে বলেন, 'দেখাই হয় নি ওর সঙ্গে।'

'কেউ কি ওর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে?

মা উত্তর দেন 'রাত দশটা সাড়ে দশটায় মেসে ফেরে। সারাদিন নাকি অনেক ছেলে-মেয়ের আনাগোনা। ঠিক মত খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত করে না। এ সবই মেসের লোকদের কাছ থেকে জেনেছি আমি।'

'হুঁ।' বলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যান বাবা। খানিকক্ষণ পর প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করেন, 'চারুর বিয়ের ব্যাপারটা এখন না হয় তোলা থাক। শ্যাম-চরণকে যেমন স্বাধীন পথে চলতে দিয়েছ, চারুকেও না হয় সেভাবেই চলতে শেখাও।'

মা বিস্মিত চোখে বাবার দিকে চেয়ে থাকেন।

বাবা বলেন, 'ভাবছ পুরোন পন্থীর মুখে এ আবার কী কথা! বিশ্বাস করো,

সংস্কারের বদ্ধ ডোবা থেকে মুক্ত হয়ে এখন নিজেকে অনেক হালকা মনে হয়। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় এটা। এখন কি পুরোন ভাবনা-চিন্তা আঁকড়ে ধরে থাকলে চলে? চতুর্দিকের হত কুচ্ছিৎ চেহারা দেখছি। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রেম সব উধাও হয়ে যাচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণের পথ কেউ বের করে দেবে না, যা কিছু সব নিজেদেরই করতে হবে। শ্যামাচরণ যদি রাজনীতি করে তো করুক না। অন্য সকলে এগিয়ে যাক, নিজের ছেলেকে আড়াল করে রাখব, এ যে মহা স্বার্থপরতার ব্যাপার! ভেব না, এসব আমি আবেগ বশে বলছি। ইদানীং এটাই আমি মনে প্রাণে চাইছিলাম। আমি একবার কলকাতায় গিয়ে সব দেখে আসব ভাবছি।'

দুদিন পর দাদা হঠাৎই বাড়িতে চলে এল। আমরা তো অবাক। বাবা বাড়ি ছিলেন না। দাদাকে ভীষণ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। কেন যেন ওকে আমার অন্য মানুষ বলে মনে হল।

আমাকে দেখে দাদা স্বাভাবিক হাসি বজায় রেখেই বলল 'মাত্র ক'দিনের মধ্যেই যে কলাগাছ হয়ে গেছিস, মাথায় অঙ্ক-টঙ্ক ঢুকছে তো, না, গোল্লার ঘরে দাঁড়িয়ে আছিস এখনও?'

আমি বললাম, 'এবার আমি অঙ্কে পঞ্চাশ পেয়েছি।'

দাদা সহাস্যে বলে, 'এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা।'

'তাও হয়।' আমিও হেসে জবাব দিই। বলি, 'তোকে এমন দেখাচ্ছে কেনরে? শরীর ভাল নেই নাকি?'

'নাহ্, তেমন কিছু নয়। সামান্য মানসিক অশান্তি চলছে।'

মা অমনি ব্যাকুল হয়ে বলেন 'অশান্তি আবার কিসের?'

দাদা উত্তর দেয় 'তুমি গেলে দেখা হ'ল না, বাবাও গিয়েছিলেন, তাও হয় নি। হঠাৎ তোমাদের ওখানে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে বুঝে পাচ্ছি না।'

মা সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'তোর অত টাকার কিসের প্রয়োজন? আমি আর কতদিন তোর মামাদের কাছে হাত পাতব?'

দাদা নিরাসক্ত গলায় উত্তর দেয়, 'এতে তো দোষের কিছু নেই মা। ওঁদের আছে, ওঁরা দেবে। যদি বিরক্ত হন যেও না।'

মা অমনি সামলে নিয়ে বলেন, 'না, না, ওঁরা সেরকম নয়। ওঁদের একমাত্র বোন আমি, ওঁরা আমাকে খুব বোঝে।'

দাদা এর উত্তরে বলে, 'একমাস যেয়ো না ও বাড়ি। বোঝেনই যদি তো

ওরাই উপযাজক হয়ে তোমার কাছে আসবেন, যদি না আসেন তো বুঝবে তোমাকে ওঁরা ভিখিরি ভাবেন।'

এত স্পষ্ট উত্তর দাদার তরফ থেকে আসবে এ বোধ হয় মা-ও বুঝতে পারেননি, আমি তো নয়ই।

মা প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলেন, 'ওরা চারুর বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে! তোর বাবার মত নেই। কী করি বল তো?'

দাদা উত্তর দেয়,' বাবার মত নেই যখন তখন মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করছো কেন?'

আমি দাদার কথায় ভীষণ খুশি হই।

মা বলেন, 'সবাই বলে তুই সময় মত মেসে ফিরিস না, খাওয়া-দাওয়াও ঠিকমত করিস না, এসব কি সত্যি?

'কিছুটা।' একটুক্ষণ চুপ করে থেকে দাদা বলে, 'ওদের খুব সহৃদয় মনে করেছ তাই না? আসলে ওরা কতগুলো মানুষের চেহারায় জন্তু বিশেষ। কিছু কিছু জন্তুর কৃতজ্ঞতা বোধ আছে, ওদের তাও নেই।'

মা বলেন, 'এতটা নিচে নামানো বোধ হয় ঠিক হল না তোর?'

দাদা সে কথায় শব্দ করে হেসে ফেলে। বলে, 'তুমি যখন বলছ, ওসব আর মাথাতেই রাখবনা।'

মা বলেন, 'তোর শরীর খুব ভেঙে গেছেরে শ্যামা?'

দাদা সহাস্য ভঙ্গিতে উত্তর দেয়, 'বাঙালী মায়েরা চিরকালই ছেলে-মেয়েদের রোগা দেখে, দুর্বল ভাবে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'এমন করে বলছিস যেন অনেক বিদেশী মায়েদের তুই দেখেছিস।'

দাদা বলে, 'সব কিছু কি চোখে দেখার প্রয়োজন হয়। তুই-ও যে পাল্টেছিস, তা কী চোখ এড়িয়ে গেছে আমার।' বুকের ভেতরে হঠাৎই কাঁপুনি শুরু হয়। আমি নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকি।

দাদা বলে, 'কি হলো? অমন ফ্যাকাশে মেরে গেলি কেন?

'নিজের মুখ কি কেউ দেখতে পায়?

'না তা পায় না। তার জন্যে আয়নার দরকার হয়। ধর, আমিই সেই আয়না'। দাদা উত্তর দেয়।

নিজেকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করে বলি, 'একটু আগে আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম

তুই তখন 'নাহ্' বলেই উড়িয়ে দিয়েছিস। শুধু মানসিক অশান্তির কথা বলেই, নিজেকে এড়াতে চেয়েছিস। এখন আমি যদি বলি, আমি হচ্ছি সেই আয়না যাতে তোকে প্রচণ্ড অস্থির ও ভাঙাচোরা মনে হয়েছে।'

দাদা নিষ্পলক চোখে আমাকে দেখে বলে, 'তোর কাছে হার মানতেই হ'ল।' বলেই গম্ভীর মুখে বসে রইল।

মা বলেন, 'ও সব থাক না এখন। তোর অত টাকার প্রয়োজন কিসের তা জানতে চেয়েছি বলে, কিছু মনে করিসনে। আমার জেদ চিরকালই একটু বেশি। ওই যে তুই বললি, ও বাড়ির সঙ্গে একমাস সম্পর্ক না রাখতে তা কিন্তু আমি পারবো না। কেন জানিস, ও সংসারে আমারও কিছু অধিকার আছে। আমি ভিক্ষে নিতে ওদের ওখানে যাইনা। বাবা আমার নামে পাঁচ বিঘে জমি রেখে গেছেন। বছরে ওই জমি থেকে যা রোজগার হয়, তার এক চতুর্থাংশও ওদের কাছ থেকে আমি নিই না। ওরা কি ভাবে জানি না। তবে আমার বিশ্বাস ওরা মনে মনে ওই যৎসামন্য টাকা দিয়ে ঝামেলার হাত থেকে মুক্ত হতে চায়। বৈষয়িক বুদ্ধি একেবারেই যে আমার নেই তা নয়, আমি চাই সম্পর্কটাও ঠিক থাক, আবার আমার চাহিদাও মিটুক। একথা তোদের বাবাও জানেন। প্রথম প্রথম ওঁরও খুব সঙ্কোচ ছিল, যেদিন সব জানলেন, সেদিন থেকে ওঁকে নিশ্চিন্ত হতে দেখেছি। আত্মসম্মানে এতটুকু আঁচড়-লাগে এটা উনি একদমই বরদাস্ত করতে পারেন না।' মা একটানা কথাগুলো বলে একটু-গাঢ় শ্বাস ফেললেন। পরে ফের বলতে লাগলেন, 'যেদিন বুঝবো ওঁরা আমাকে পছন্দ করছে না। সেদিনই আমি সব সম্পর্কের শিকড়টাকে উপড়ে ফেলবো, জমি বেচে দেবো, যে টাকা হাতে আসবে তাতে তোর পড়াশুনোর খরচাপাতি চলে যাবে।'

মা'র চোখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে দাদা বলে, 'আমি সবই জানি। তবে কি জান, টাকা জিনিসটা বড়ই সাংঘাতিক। না দিতে পারলে, কে দিতে চায় বলো?'

'তার মানে, আমার দাদরা আমাকে বঞ্চিত করতে চায় মনে মনে, এই কী তুই বলতে চাইছিস?

দাদা বলে, 'বড় মামা একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, জমিজমা তদারকি করা যে কী কষ্ট তা হেম বুঝবে না।'

'এতদিন তা হ'লে বলিস নি কেন?

'এবার সেটাই বলবো বলে এসেছি।'

'তার মানে ?'

দাদা ধীর গলায় বলে 'ওসব সিঁড়ি ভাঙা বিদ্যের আর আমার প্রয়োজন নেই, আমি গ্রামে গিয়ে তোমার সব কিছু তদারকি করবো ভাবছি। ওখানে কিংবা অন্য কোথাও একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো। বলতে পার, অসহায় কিছু-মানুষজনকে নিয়ে একটা শান্তি আশ্রম গড়বো। এরকম তিনচার জনকে আমি জোগারও করে ফেলেছি। এখন শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষায় বসে আছি।'

মা এসব শুনে বিশ্বাসই করতে পারলেন না।

মা অনেকটা বন্ধুর মত ভঙ্গি করে আমাকে লক্ষ করে বললেন, 'তোর দাদার মাথাটা খারাপ হয়ে গেল না তো চারু! শিগ্গির ওর মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাল।' বলেই হাসতে থাকেন।

দাদা যে কী ধরণের মানুষ তা আমার থেকে মা ভালই জানেন। আবেগ প্রবণ ও হঠকারী বললে ভুল হবে, ও যে অনেকটা রুক্ষ কঠোর বাস্তবের পথ ধরেই চলে তা কিন্তু আমি বিশ্বাস না করে পারি না।

মা প্রসঙ্গ পাল্টাবার উদ্দেশ্যই বলেন, 'চারুকে গান শেখাচ্ছি হিমাদ্রির কাছে। ও-তো তোর থেকে দু এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো তাই না ?'

দাদার স্মৃতিশক্তি প্রখর। বলে, 'চিনতে পারবো না, তা কী হয়। ওর মতন মানুষ হাতে গুণে পাওয়া যায়। সচ্চরিত্র, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান। তবে চিরকালই ও বড় বেশি রুগ্ন।'

মা ভুরু কুঁচকে তাকান এ কথায় আমার দিকে। পরক্ষনেই চোখ নামিয়ে নিয়ে বলেন. 'হ্যাঁ, দিনকুড়ি হতে চলল ও বিছানা নিয়েছে। বড় চিন্তা হয় ছেলেটার জন্য।'

দাদার ভাবান্তর হল না মোটেই। স্মিত হেসে বলল, 'চারুকে গান শেখাতে গেল কেনে হঠাৎ ? বিয়ের বাজারে ওর একটু দর বাড়াবে বলেই কী ?'

আমি সলজ্জ ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে থাকি।

'খামোখা তোমরা ঝঞ্ঝাট বাড়াও। চারুর যা রূপ তাতে কোনদিন দেখবে, সাগর পার হয়ে কোন রাজপুত্র এসে হাজির হয়ে গেছে।' বলেই হাসে দাদা এবং পর মুহূর্তেই বলতে থাকে 'স্ত্রী স্বাধীনতার আমি বিরোধী নই। মেয়েরা রান্নাঘর আর আতুড় ঘর করুক এ আমি বরদাস্ত করতে পারি না। কবে যে এ দেশের মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য বোধ, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠবে, জানি না। যাক্, এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। আমার দুশ্চিন্তা স্বপ্নের

প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে। কী জানি, সফল হতে পারব কিনা।'

মা বলেন 'ও সব ভূতুড়ে চিন্তা তোর মাথায় এল কি করে?'

দাদা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ক্যানিং-এ আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, নিছকই আনন্দ করবো মন নিয়ে। কিন্তু তা আর হল না। কুবের মণ্ডল বলে একজনের সঙ্গে দেখা। লোকটা পাগল নয়, অথচ সবাই ওকে পাগলভাবে। এই যে খুনোখুনির রাজনীতি চলছে তারই শিকার হল কুবের মণ্ডল। ঘরামির কাজ করতো ও। বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যের অন্ধকার নেমে এসেছে। ঠিক সেই সময় ও আমারই বয়সী একজনকে পাঁচ-ছ'জনার হাতে খুন হতে দেখে। আবছা অন্ধকারেও আততায়ীদের চিনতেও পারে। ওরাও দেখে ফেলেছিল কুবেরকে। ঠাণ্ডা মাথায় এমন করে মানুষ মানুষকে খুন করতে পারে এটা কুবের কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওরা কুবেরকে শাসায়। ঘূণাক্ষরেও যদি কারো নাম ও প্রকাশ করে তো বংশ শুদ্ধ সকলকেই শেষ করে দেবে বলে। ও চুপচাপ সব শুনল। এখানে-ওখানে ঘুরল, কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। বাড়ির লোক, পাড়া প্রতিবেশীরা ভাবল, ও পাগল হয়ে গেছে। সে শুনে কুবের হেসে বাঁচে না। তারপর ওর ভাইরা ওকে ঘর থেকে বের করে দিল। আমাদের দেখে কুবের ছুটে এসে বলল, 'পালাও এ গাঁ ছেড়ে। নইলে খুন করে নদিতে ভাসিয়ে দেবে।' আমার কেমন যেন খট্‌কা লাগল। সকলেই বেশ নির্বিকার। একদিন সকলের চোখ এড়িয়ে কুবেরের সঙ্গে দেখা করলাম। ওকে নির্ভয়ে সব বলতে বললাম। কী জানি কেন ও আমাকে বিশ্বাস ক'রে ওই সব বলে। আর্তনাদ করে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বলতে থাকল, 'একজন মানুষ হয়ে, একজনকে প্রাণে বাঁচাতে পারলাম না। এর চেয়ে ঘেন্নার জীবন আর কী আছে বলতে পার? গাছের ডালে দড়ি বেঁধে জীবন শেষ করে দেব একদিন। এই লজ্জার জীবন রেখে লাভ কী?' কুবের আমার সব স্বপ্নকে চুরমার করে দিল। একে বাঁচাব এই প্রতিজ্ঞা করে নিয়ে এলাম নিজের কাছে। তুমিই বলো, 'আমি কী ভুল করেছি মা।'

মা নির্বাক, নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকেন। গাঢ় করে শ্বাস টেনে বলেন, সত্যিই যদি তুই ওকে বাঁচাতে পারিস তো, আমি বুঝবো তুই একটা কাজের কাজ করেছিস। সকলেই তো সংসার করে, তুই যদি বড় সংসারে জড়িয়ে পড়তে পারিস তো গর্বের শেষ থাকবে না আমার।'

গড় হয়ে মা'র পায়ে মাথা ছোঁয়ায় দাদা। উঠে বলল, 'এর পরের কাহিনীটা কিন্তু আমাকে নিয়ে। জানি না, এটাকে তুমি কেমন করে নেবে। তবু আমাকে সব বলতেই হবে। বাবা থাকলে খুব ভাল হত। চূড়ান্ত সব কিছু তোমাদের সামনে হওয়াটাই ভাল।'

আমি আর মা দু'জনাই এ কথাতে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি।

'বেশ তো উনি আসুন, তার পরই না হয় বলিস।' মা বলেন।

'হ্যাঁ সেই ভাল, আমার দিকে ফিরেই বলল দাদা, 'হিমাদ্রিকে একটু দেখে আসি চল!'

মা বাধা দিয়ে বলেন, 'ও আবার যাবে কা। তুই আসার আগেই ও ওকে দেখে এসেছে। এবার বরং তুই একা যা।'

দাদা কথা না বাড়িয়ে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় হেসে বলল, 'চারু একটু চা করে খাওয়া তো।'

মানুষটা নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত উদাসীন হল কী করে? যার ওপরে এ বাড়ির সকলের প্রত্যাশা আকাশ ছোঁয়া, সব জেনেও সে এমন নিস্পৃহ থাকতে পারে এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তবু কেন যেন দাদার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস! আর দশ জনের থেকে ও যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির সেটা সকলেই টের পেয়েছিলাম। মা যা সহজে মেনে নিতে পারলেন, বাবার পক্ষে কী এত সহজে সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব? যদি পারেন তো কথাই নেই কিন্তু না পারাটাই স্বাভাবিক। দাদার সব কিছু শুনে বাবা যদি হতাশায় ভেঙে পড়েন, তাহলে বাবাকে যে সামলানই কঠিন হবে। এ সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে দাদার জন্য চা করতে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকি। স্টোভ জেলে চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে ভাবতে থাকি, নিজের কথা!

এ কী হয়ে গেল মাঝখান থেকে। যা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি, সেটাই এমন করে এই ছোট্ট জীবনের আঙিনাকে ভরিয়ে তুলল কী ভাবে? দাদার মত ক্ষ্যাপামি কী আমার মধ্যেও আছে? নাকি, হিমাদ্রির আর্থিক অসচ্ছলতার কথা ভেবেই নিজেকে এমন করে বিলিয়ে ছিলাম ওর কাছে।

তা হ'লে কী এর পেছনে ভালবাসা নেই, আছে করুণা! কিন্তু হিমাদ্রি তো আমার কাছে করুণা চায় নি। সামান্য ক'টা টাকার জন্যই কী ও আমার কাছে আসতো তাহ'লে? আমার এমন উজ্জ্বল করা রূপ এটাই কী ওকে আকর্ষণ করেছে বেশি। কি করে জানতে পারবো এ সব কথা, এ সব চিরকালই

হয়তো গভীরগোপন হয়ে থাকবে। কেতলিতে জলের শোঁ শোঁ শব্দ হওয়ায় আমার ভাবনায় অবসান ঘটে। আমি সন্তর্পনে চা করায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি। একবার গেছি বলে কী আর একবার ওর কাছে যেতে পারি না! মা কেন আজ এমন কঠোর হলেন বুঝতে পারছি না।

চা করে বাইরে এসে দেখি দাদা ও মা চুপচাপ বসে আছে। এ রকম তো হওয়ার কথা নয়।

দাদা আমাকে দেখেই বলে, 'চারুকে রান্না ঘরে বড় বেমানান। এই সামান্য চা করতেই ওর মুখ কেমন লাল হয়ে গেছে দেখ?'

মা বলেন, 'মেয়ে হয়ে জন্মেছে যখন, তখন তো এসব করতেই হবে শ্যামা।'

এই দীর্ঘ সময় পর মা দাদার নাম ধরে সম্বোধন করেন। এতে আরও বেশি আশ্চর্য হই আমি।

দাদা সহাস্যে বলে, 'সকলকেই ধরাবাঁধা আলপথ দিয়ে হাঁটতে হবে, এটা কোন যুক্তিই হল না।'

মা কথা বাড়ান না, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন গাঢ় করে।

চায়ের কাপে চুমুক বসিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত গলা করে বলে দাদা, 'ফুল মার্কস না দিয়ে পারলাম না।'

'চারু, খাঁচায় ঢোকার প্রথম ধাপটা তুই বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেছিস দেখছি।'

আমি হেসে বলি, 'তোরা পুরুষরা তো আমাদের জন্য এক কণা জমিও ছাড়বি না।'

'ছাড়লেও পুরোপুরি দখল নিতে পারবি না তোরা।'

'ছেড়েই দেখ না।'

দাদা সহাস্যে বলে, 'সারেণ্ডার করলাম। পারিস তো, আমাদের কাছ থেকে সবকিছু জোর করে ছিনিয়ে নে।' ঠিক সে সময় বাবা শ্রান্ত অবসন্ন ভঙ্গিতে বাড়ির ভেতরে ঢোকেন। দাদাকে দেখে বলেন, 'কখন এলি?'

দাদা উত্তর দেয়, 'তুমি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই।'

বাবা ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে বলেন, 'মন বলছিল তুই আসবি।'

সে কথায় হঠাৎই বুকটা আমার ধক করে উঠল। ঠিক এরকম ভঙ্গিতেই তো হিমাদ্রিও সেদিন, এই কথা বলেছিল আমাকে। দাদা কী টেলিপ্যাথী বলে উত্তর দেবে নাকি?'

কিন্তু সেটা এক্ষেত্রে হল না। দাদা বলল, 'চারু, বাবাকে একটু চা করে দে না।'

মা বাধা দিয়ে বললেন, 'না না ওসবের এখন আর দরকার নেই।' বাবাকে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি মুখ হাত ধুয়ে একটু জিরিয়ে নাও, তোমার জল-খাবার আমিই এনে দিচ্ছি।'

বাবা জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধোবার জন্য কলঘরে চলে যান।

বাবাকে কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগে। অজানা এক ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাষ আমি টের পাই। সে সময় ভীষণ অস্বস্তি হতে থাকে আমার।

মা বলেন, 'তোর বাবার চেহারাটা কী হয়েছে দেখলি তো। এসব দেখেও কী তুই চোখ বুজে থাকবি ?'

দাদা স্পষ্ট উত্তর দেয়, 'মাগো, সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক আমার জীবনে নেই। আর দশ জনের মত যদি হতে পারতাম তো কথাই ছিল না। তোমরা গর্ব করতে, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীরা ধন্য ধন্য করতো। কিন্তু তা হবার নয়। যা হবার তা তো হয়েই গেছে ইতিমধ্যে।'

'কী হয়েছে তোর শ্যামাচরণ ?' মা'র ব্যাকুল প্রশ্ন।

'বলেইছি তো, সব-হারান কিছু মানুষজন নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবো। যদি পারি তো বুঝবো, এ জীবন সার্থক হল। সকলে কী সবকিছু করতে পারে ? আমাকে কেউ যদি প্রধান মন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দেয়, তাহলেই কী আমি সফল হতে পারবো। রাজনীতির কূটকচালি তো আমি বুঝিই না। ফলে দেশকে লবডঙ্কা দেখান ছাড়া কিছুই করতে পারবো না আমি।'

মা গম্ভীর হয়ে যান সব শুনে।

শীর্ণকায় হলে কী হবে বাবাকে বড় সৌম্য আর প্রশান্ত দেখায়। বললেন, 'পরীক্ষা দাও নি শুনলাম।'

মা অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে রইলেন দাদার দিকে। অস্ফুটে শুধু বললেন, 'সে কী ?'

দাদার মধ্যে অস্থিরতার বিন্দুমাত্র প্রকাশ চোখে পড়ল না আমার। অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ী ভঙ্গি নিয়ে দাদা উত্তর দেয়, 'সেকথা মাকে বলেছি।'

'পরীক্ষা দিস নি একথা তো বলিস নি।' মা প্রশ্ন করেন।

দাদা হেসে উত্তর দেয়, 'বলেইছি তো ধরাবাধা জীবন আমার নয়। এতেও যদি না বুঝতে পার তো আমি কী করতে পারি!'

বাবা বলেন, 'কী করবে ঠিক করেছ ?'

দাদা বলে, 'সেটা পরে বলছি। আগে যা বলি শোন। আমার এক বন্ধুর সর্বনাশ হয়ে গেছে। ও রাজনীতি করতো। কিছু নারী মাংসাসী আমার বন্ধুর বোনের সর্বনাশ করলো, ওদের বাড়ি-ঘর সব পুড়িয়ে দিল। সংবাদ পেয়ে আমরা সবাই ছুটে গেলাম। এ রকম কত ঘটনা রোজ ঘটছে, খবরের কাগজে সব বেরোয় না। এখনও কিছু সজ্জন, হৃদয়বান মানুষ আছে, তাই সমাজও বোধ হয় টিঁকে আছে। ওদের সঙ্গে আমরা হাত মেলালাম। ঘর তুলে দিলাম। পুলিশ দর্শকের ভূমিকা নিল। দু-চার জনকে এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করলো। কিন্তু আসল যারা পর্দার আড়ালে ছিল, বুক ফুলিয়ে সকলে পুলিশের সামনেই ঘোরাফেরা করতে লাগল। মেয়েটির এমন সর্বনাশ করল যে প্রাণে বাঁচারই আশা ছিল না। যাই হোক, মেয়েটির মন্দভাগ্য বেঁচে গেল। কিন্তু কি নিয়ে সে বাঁচবে ? লোকচোখে হেয় আর ঘৃণার পাত্রী ছাড়া আর কিছুই যে ছিল না তার। একদিন ও আত্মহত্যা করতে গেল, টের পেয়ে আমি ওকে ফের প্রাণে বাঁচালাম। মেয়েটি বলল, 'কেন বাঁচালেন ?' আমি বললাম, 'জন্মেছ যখন মরতে তোমাকে একদিন হবেই। তবে যে জীবনটাকে তুমি নোংরা, আবর্জনার মত ভাবছ, তার জন্য তো তুমি দায়ী নও। সুতরাং গ্লানিমুক্ত হয়ে জীবন কাটাবার চেষ্টা কর। ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল। ভাবলাম, মেয়েটিকে যখন প্রাণে বাঁচিয়েছি, তখন সসম্মানে বাঁচা'ই না কেন ? মনস্থির করে ওকে বিয়েও করে ফেললাম। এবার বলো, আমার কী পথ ? জীবনের জটিল জলস্রোতে হাবুডুবু খাওয়ার থেকে, এ একরকম ভালই হল বলে আমার মনে হল। এ পর্যন্ত বলে দাদা কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল। পরে বলল, 'আজ এ ঘটনা কিন্তু এ বাড়িতেও হতে পারে। যদি হয়, তখন ? তখন তোমরা কী করবে বলতে পার ?'

বাবা চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'সাবধান শ্যামাচরণ, একথা দ্বিতীয়বার মুখেও এনো না। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই জেনো। পার তো, এক্ষুনি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও।'

দাদা উঠে দাঁড়ায়। ঋজু ভঙ্গিতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যায়।

সেদিন দাদার জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও আমি খরচ করিনি।

কিন্তু আমরা ঘূর্ণি ঝড়ের আবর্তে পড়ে গেলাম।

সেই যে দাদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, বাবা খোঁজ-খবরও করলেন না। মা

আড়ালে চোখের জল ফেললেন। কাঁটা বিছোন বাড়ির পরিমণ্ডলের মধ্যে আমি দিন দিন অসহায় হয়ে যেতে লাগলাম। যুক্তির বিচারে বাবাকে যতটা দোষী মনে হয়, দাদা হয়ে ওঠে ঠিক ততোধিক প্রণম্য। এক এক করে দাদা সংগ্রহ করে চলেছে অসহায় মানুষ, ওদের পায়ের নিচে মাটি খোঁজার দায়িত্ব নিয়েছে নিজের কাঁধে, এ যুগে এমন দৃষ্টান্ত কী সত্যিই বিরল নয়? এই সব ভাবি, মন থেকে কালো মেঘের ওড়নাটা যখন সরে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই হিমাদ্রির কাছে যাওয়ার অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করি। সে যে কী আকর্ষণ, তা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই। হিমাদ্রির কাছে নিঃসংকোচে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করি। কেউ কিছু মনে করে না। হিমাদ্রি একদিন বলল, 'জান চারু তুমি এলে আমার সুখ হয় খুব, না এলেই অসুখের দাপট বেড়ে যায়। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ আছে, মানবে?'

আমি বলি, 'সব কিছু না শুনে হ্যাঁ বলার মেয়ে আমি নই। আগে শুনি অনুরোধটা কী?'

হিমাদ্রি উত্তর দেয়, 'আমার ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে এমন করে জড়িয়ো না।'

শুনে কষ্ট পেলাম ঠিকই কিন্তু এই মুহূর্তে ওর মুখে বেদনার প্রতিফলন দেখতে পাই। স্বার্থপরের মত আমি উত্তর দিতে পারতাম, বেশ তো এখন থেকে তোমার কাছে আর আসব না। তাতে সম্ভবত তোমার দুঃখ দূর হতে পারে। কিন্তু আমার কি হবে তা কী একবারও ভেবে দেখেছ? কিন্তু এসব মুখে প্রকাশ করতে পারি না। আমি স্পষ্ট উত্তর দিই, 'এটা রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় হিমাদ্রি।'

হিমাদ্রি যুক্তি দিয়ে বলে, 'ধরো যদি আমি সুস্থও থাকতাম, তা হলেও আমাদের বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য করতেই হত। কেননা, তোমার বাবা কিছুতেই আমাকে মেনে নিতে পারবেন না।'

'সেটা না হয় ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক।' আমি উত্তর দিই।

হিমাদ্রি বলে, 'জীবনের সব কিছুই কী ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিতে পারে মানুষ? বর্তমানকে নিয়ে একটুও চিন্তা না হয়ে কী পারে?'

আমি ওর কথার গুরুত্ব দিয়েই বলি, 'আর সে জন্যই তো তোমার কাছে না এসে পারি না।'

হিমাদ্রির রক্তহীন মুখে খুশির আলো ঝলকায়, কোন দ্বিধা সংকোচের ধার না ধেরে বলে, 'তা হ'লে এসো।'

আমি ভরাট অভিমান বুকে নিয়ে জিজ্ঞেস করি, 'আমি এলে কী তুমি খুশি হও না ?'

হিমাদ্রি উঠে বসে মুহূর্তেই আমার দুটো হাতকে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে চুমু খায়। বলে, 'শুয়ে শুয়ে ভাবি আমার একখানা আকাশ আছে, আর সে হচ্ছো তুমি। কে চায় না আকাশ দেখতে, বলো ?'

ওর আদর সোহাগ পেতে আমার উদ্বেলতার সীমা থাকে না। সেই মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করি হিমাদ্রির কাছে। হিমাদ্রি আমার মুখে হাত বোলাতে বোলাতে এক সময় আমার কপালে গালে ঠোঁটে চুমু খায়।

আমি আহ্লাদে বলি, 'খুব দুষ্টু তো তুমি ?'

ও হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে, তা দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বলি, 'আর কখনও আমার সামনে চোখের জল ফেলবে না।'

হিমাদ্রি নিজের সংবিৎ ফিরে পায়। বলে, 'কথা দিচ্ছি, যতদিন বাঁচবো, কোনদিন চোখের জল ফেলবো না।'

অনেক সম্পদ নিয়ে আমি বাড়ি ফিরি। এত সম্পদ আমি রাখব কোথায় ?

এরও দিন কয়েক পর ঘাটশিলা থেকে দাদার চিঠি আসে। এই সংবাদে বাড়ির আবহাওয়া সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মা-কে অনেক দিন পর হাসতে দেখি। কিন্তু এর মধ্যে ভাগ্যবিধাতা আমারই বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় বুঝি। সেই ষড়যন্ত্রের পেছনে কাল হ'ল আমার অসামান্য রূপ।

চোরবাগান আর সিমলের মুখুজ্জেরা একই বংশের হলেও ওদের মধ্যে ছিল অহি-নকুল সম্পর্ক। এখন এই বংশের আভিজাত্যের শিখা প্রদীপের শেষ তলানিতে এসে ঠেকেছে। তবুও ঠাঁট-ঠমক বজায় রাখায় ওদের প্রাণান্তকর লড়াই। আর সেই লড়াইয়ের শিকার হলাম আমি।

আমার অত্যুজ্জ্বল রূপের কথা চোরবাগান আর সিমলেয় গিয়ে পৌঁছুল। চোরবাগানের সনাতন মুখুজ্জের সঙ্গে লড়াই বাঁধল সিমলের সুরেশ মুখুজ্জের। সনাতনের ছেলে প্রদীপ রূপে-গুণে চমৎকার, আর ঠিক উল্টোটা ছিল সুরেশ মুখুজ্জের ছেলে রমেশ। ওরই ডাক নাম গণা। সনাতনের পয়সার জোর যা ছিল তাতে সুরেশ কুপোকাৎ হয়ে যেত সহজেই। কিন্তু আমার মা হেমলতা বিষয় বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ ছিলেন। দাবার চালটা মা-ই দিলেন। প্রচলিত নিয়ম

অনুযায়ী মেয়ে পক্ষকেই পণ দিতে হয়। মা স্বীকার করলেন না সে কথা। ওঁদের দুজনকেই আলাদা-আলাদা ভাবে বললেন, 'আমার মেয়ে আপনার ছেলের বউ হবে, এতো ওর পরম সৌভাগ্য। কিন্তু প্রচলিত নিয়মের একটু হেরফের করতে হবে যে। মেয়েকে আগাগোড়া সোনার গয়নায় ঢেকে তো দেবেনই, এছাড়াও দশ হাজার টাকা নগদ আমাকে দিতে হবে।'

এটায় সায় দিতে পারল না সনাতন মুখুজ্জে। ছেলে তার রত্ন। সেই রত্নটির পেছনে অনেক যত্ন ও অর্থব্যয় হয়েছে। তাছাড়া পণ নেওয়া গর্বের, দেওয়ার মাঝে হীনমন্যতাই প্রকাশ পায়। যদিও শুনেছি প্রদীপ আমাকেই বিয়ে করতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু যে জেদ ও পৌরুষ থাকলে ও আমাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে পারত তা ওর একদমই ছিল না। ফলে, আমাকে আমার মা পণ্য সামগ্রী হিসেবে দেখে, ভাল টাকায় বিক্রী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এর জন্য আমাকে অনেক ক্ষয় স্বীকার করতে হয়েছে। সেটার জন্য হয়তো বা হিমাদ্রির একটা বড় ভূমিকা ছিল। সেটা না জানালে আমার কথা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। আগেই বলেছি, হিমাদ্রি শারীরিক ভাবে দুর্বল হয়েই জন্মেছিল, তার ওপর ছিল প্রচণ্ড অর্থাভাব। কিন্তু আমার আর ওর ভাগ্যই ছিল ঢালু নদির পারের মত। জল সেখানে কোনভাবেই দাঁড়াবার সুযোগ পায় না। ভাগ্য বিশ্বাস করি না, এ কথা বলার মত স্পর্ধা আমার নেই ; আর সেই ধাতুতে আমি তৈরী নই। হিমাদ্রির আসল রোগ বুকের নয়, যেটা ছিল সেটা আরও মারাত্মক। ওর স্নায়ুগুলো শুকিয়ে যাচ্ছিল একে একে। এরই পরিণতি স্বরূপ ও ক্রমশই পঙ্গু হয়ে যেতে লাগল। যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিনই ওকে অপরের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। এই সংবাদটা হিমাদ্রি এমনভাবে আমাকে জানাল, যেন খুব মজার ব্যাপার। নিজে আমি হিমাদ্রিকে চোখের জল ফেলতে বারণ করেছি, সেই আমিই বা কী করে ওর কথায় কেঁদে ভাসি? বুকের মাঝে দুঃখের বোঝা নিয়ে আর কাঁটার বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি ওর কথা ভাবি।

যেদিন হিমাদ্রি এ কথা বলল, সেদিনের কিছু সংলাপ এখনও আমার মনে আছে।

হিমাদ্রি : সত্যিই যদি আমাকে ভালবেসে থাক তো তোমাকে বিয়ে করতে হবে অন্য কাউকে। সারাজীবন একজন অথর্ব, অক্ষম মানুষের জন্য নিজেকে তুমি এভাবে নষ্ট করতে পারবে না।

আমি : তোমার কথা না হয় মেনে নিলাম, কিন্তু আমারও একটা শর্ত তোমাকে মেনে নিতে হবে।

হিমাদ্রি : শর্তটা কী শুনি ?

আমি : বিশেষ কিছুই নয়। যতদিন তুমি বাঁচবে, ততদিন তোমাকে আমার অর্থ সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

হিমাদ্রি : কি অধিকারে ?

আমি : যে অধিকারে তুমি আমাকে অন্য কাউকে বিয়ে করার কথা বলতে পারলে, ঠিক সেই অধিকারে।

হিমাদ্রি : বেশ নেব। কিন্তু একটা কথা…

আমি : কি কথা ?

হিমাদ্রি : এটা গোপন রাখতে হবে তোমাকে। আমার গোপন কৌটোয় তোমাকে আমি রেখে দেব, আর তোমার বুকের অন্দর মহলে আমাকে রেখে দেবে, কেমন ?

আমি : কথা দিলাম। কিন্তু কখনও যদি তুমি এটাকে করুণা ভেবে বসো ?

হিমাদ্রি : তোমাকে ভালবাসি এই তো আমার গর্ব। করুণার কথা ভেবে তোমাকে আমি ছোট করবো কেন ? বাস্তবিকই তো আমার টাকার দরকার হবে, সেটা না থাকলে তো আমার চলবে না।

সেদিনই আমি হিমাদ্রির ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুমু খেয়েছিলাম। আমি বুঝি ওকে সেদিন গোপন চোখের জলে বরণ করে নিয়েছিলাম। তাহ'লে ঘটনাটা কি দাঁড়ায়। শাস্ত্রীয় মতে যাকে আমি বিয়ে করবো, নেহাতই হবে লোক দেখান স্বামী। তাহ'লে তো আমি হয়ে যাব ব্যভিচারিণী! বাইরে এসব কথা অনেকক্ষণ ধরেই ভেবেছি। পরে এক সময়, অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়েছি। একদিন আমার ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর বাড়িতে প্রথম যেদিন আসি সেদিন আমার বেশ মনে আছে প্রায় পাঁচশো টাকার বাজি পুড়িয়েছিলেন আমার শ্বশুর মশাই সুরেশ মুখুজ্জে ওই চোরবাগানের মুখুজ্জে বাড়ির সামনে।

আমাকে অমন হতচকিত হতে দেখে রমেশ মুখুজ্জে বলেছিল, 'আজ থেকেই চিনতে শেখো সিমলের মুখুজ্জেদের দাপট। তোমার শ্বশুর মশাই সুরেশ মুখুজ্জে কি চীজ তা স্বচোক্ষে দেখো। একথা যখন ও বলছিল, তখন ওর মুখে চোখে বিশ্বজয়ীর হাসি আমার নজর এড়ায় নি।

আমি কিন্তু ব্যভিচারিণী নই। রমেশ মুখুজ্জেকে আমি ঠকাই নি। ওর দৈহিক ক্ষুধা মিটিয়েছি। সূর্যকান্ত আর মিঠুর জন্ম দিয়েছি। ওদের আগে আরও একজন আমার পেটে এসেছিল, ও এ বংশের হওয়া বেশিদিন গায়ে লাগাতে পারল না। আমার তো মনে হয়, ওর এ বংশের হাওয়া সইল না।

গণাবাবু আমার স্বামী। ওকে কী চোখে দেখি আমি! দেবতা হিসেবে যে নয়, সেটা হলফ করে বলতে পারি। ও শুধু চিনেছে টাকাকে, আর আমার এই অসম্ভব আকর্ষণীয় শরীরটাকে। এটাই তো আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। আর এরই বিনিময়ে আমি মাসে মাসে ওর কাছ থেকে তিনশো-চারশো টাকা অবলীলায় হাত পেতে নিই। এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে বাড়ির সকলের চোখ এড়িয়ে হিমাদ্রির কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ওকে সাহায্য করি। হিমাদ্রি আর বোধ হয় বেশিদিন বাঁচবে না। তবুও আমার কাজ আমাকে করে যেতেই হবে।

যেদিন হিমাদ্রি থাকবে না, তখনও আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, মিঠুর ভবিষ্যৎ নিয়ে তো ওর বাবার যত না চিন্তা তার থেকে আমার চিন্তা যে অনেক অনেক বেশি। আমি যা পারি নি তা কি মিঠু সার্থক করে তুলতে পারবে? ভাবনাটা ক্রমশই আমাকে হিম শীতল প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করে। আমি মিঠুর জন্য এই প্রথম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ওর সুখ, ওর আনন্দ, ওর সাফল্যের জন্য।

মৃদুলের কথা

সময়টা ছিল খুব অশান্তি আর উদ্বেগের। উনসত্তর সালে আমি. আর্টস নিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে কাছের একটা কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে এই বৃহত্তর পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারব কিনা এ সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। আমার সম্পর্কে বাবার খুব একটা উৎকণ্ঠা ছিল না। আমার ওপর কোন খবরদারিও করতেন না আমার মা। লেখাপড়ার ব্যাপারে আমাকে পুরো স্বাধীনতাই দিয়েছিলেন ওঁরা। পাশ করার এক বছর পর আমার বাবা সামান্য রোগ ভোগের পর মারা যান। এবং এরই দু'বছর যেতে না যেতেই মা'ও আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন। তাহ'লে, এই দাঁড়ায়, আমার সতেরো আর উনিশ বছর বয়সেই আমি এই বিশাল পৃথিবীর মধ্যে

একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেলাম। মামারা এর পরই ঘন ঘন আসতে শুরু করলেন। ওঁরা নিখাদ ভাল মানুষ, আমার বিষয়ে ওঁরা বিশেষ ভাবেই ভাবিত ছিলেন। বালিগঞ্জের এই বিরাট বাড়িটাতে আমি ভীষণ শূন্যতা বোধ করতে থাকলাম। আমার বয়সী ছেলেদের কি বিষয় বুদ্ধিতে চৌখস হওয়া সম্ভব? বাবা-মা'র আমলের ঝি চাকরদের ওপরেই আমার ভবিষ্যৎ প্রায় নির্ধারিত হয়ে গেল। আমার সম্পর্কিত ঠাকুর্দাদের মধ্যে সিমলের নগেন্দ্রনাথ, ধীরেন্দ্রনাথ আমার খোঁজ করতেন। ওঁরা সকলেই আমাকে আমাদের পুরনো ভিটেয় ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। ঠিক একই কথা চোর বাগানের মুখুজ্জেরাও করেছিলেন। ওঁরা কিন্তু চোরবাগানে যাবার কথা বলেন নি, বলেছিলেন সিমলের বাড়িতেই যেতে। ভাল ভাড়াটে জোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্বও ওঁরাই নিয়েছিলেন। বাবা-মা'র কাছ থেকে আমার নিকট আত্মীয় সিমলের মুখুজ্জেদের সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছিলাম। স্বভাবতই ওদের প্রতি আমি প্রসন্ন ছিলাম না। তবু কেন যেন মন বলতো, ওটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। স্বীকার না করে পারি না, আমি এ বাড়িতে ক্রমশই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কতবার তো বাবা-মা'র সঙ্গে সিমলের বাড়িতে গেছি, সে সব সময় এ বাড়ির কেউই কিন্তু আমাকে অবহেলা করে নি বরং বলা চলে আমাকে খুব যত্নআত্তিই করেছে। চোরবাগানের রত্নেশ্বর কাকা একদিন খুব ভোরে সুবেশ এক ভদ্রলোককে নিয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে আসেন: সুরুচি আর সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ ওই ভদ্রলোকের চেহারায়। কাঁচাপাকা চুল, মোটা ফ্রেমের চশমা। বাবার সমবয়সীই মনে হল আমার ওঁকে।

রত্নেশ্বর কাকা বললেন, 'বুঝলে মৃদুল, ইনি চক্ষু চিকিৎসক। মেডিক্যাল কলেজের বিভাগীয় প্রধান। তোমার বাবার সঙ্গে এঁর যৎসামান্য পরিচয় ছিল। ইনি এ বাড়ি ভাড়া নিতে চান।'

কি মনে করে বলি, 'তিনতলার পুরো পোর্শনটা আমি নিজের জন্য রেখেই ভাড়া দিতে পারি।'

ভদ্রলোকের নাম সুবিনয় সেন। বলেন, 'তা হ'লে ছাদটা তো আমরা এনজয় করতে পারবো না।'

আমি সহাস্যে উত্তর দি, 'বাড়িটা এমন ভাবে করা যাতে ছাদের ফেসিলিটি পেতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

সুবিনয়বাবু বলেন, 'ও দু'খানা ঘর আপনি রেখে দেবেন কেন?'

আমি বলি, 'সব সত্ব খোয়াতে আমি রাজী নই বলে। এ বাড়িতে আমার অনেক স্মৃতি, বুঝতেই পারছেন। স্মৃতিটুকু থাক এটাই আমি চাই।'

ভদ্রলোক আমার কথার তারিফ করলেন। বললেন, 'তা বেশ বলেছেন, সব কিছু মুছে ফেলা ঠিক নয়। মিলেমিশে থাকব সেটা মন্দ নয়, কী বলেন রত্নেশ্বরবাবু ?'

রত্নেশ্বর কাকা সহাস্যে বলেন, 'মৃদুলের যাতে কোন কষ্ট না হয়, তা দেখাই প্রধান কর্তব্য মনে করি।'

ভাড়া মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। কেন যেন, আমার শীত করছিল।

বোঝা হল, আসবাবপত্র নিয়ে। রত্নেশ্বর কাকাকে একথা বলতেই উত্তর দিলেন, 'সবকিছুকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ও সব বেচে দিলে তুমি আপাতত স্বস্তি পাবে।'

'বেচে দেব ? না না, এ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, নিচের ছ'খানা ঘরের দু'টো ঘরও আমাকেই রাখতে হবে! তিনতলার দু'খানা ঘরে আর এক তলার দু'খানা ঘরে ওই সব মালপত্র রেখে দেওয়া সম্ভব। যদি তাতেও না হয়, তবে আপনিই না হয় এর কিছু আসবাব নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবেন।'

রত্নেশ্বর কাকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বলেন, 'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন নয় ?'

'আত্মীয়-স্বজনরা ভাববে আমি তোমাকে ঠকিয়ে নিয়েছি।'

সুবিনয়বাবুর সামনে এভাবে রত্নেশ্বর কাকাকে কথা বলতে শুনে লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মন শক্ত করে উত্তর দি, 'আমার জিনিস, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাক এ আমি চাইনা।'

যাই হোক, রত্নেশ্বর কাকা আর কথা বাড়ান না।

ডাঃ সুবিনয় সেন দিনক্ষণ দেখে যথারীতি একদিন মালপত্র নিয়ে এ বাড়িতে এলেন।

রান্নার ঠাকুরকে রেখে আর সকলকেই আমি এক মাসের আগাম মাইনে দিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম। আমার সব খবরই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সিমলের বাড়িতে।

সম্পর্কিত ঠাকুর্দা বিমলাপ্রসন্ন একদিন এসে বললেন, 'তুই আমাদের কত আদরের। তোর ঠাকুর্দা আমাদের ভালচোখ দেখতেন না বলেই বালিগঞ্জে

চলে গিয়েছিলেন। তবু দেখেছিস তো, তোরা সকলেই সিমলের বাড়িতে যেতিস। নাড়ীর টান কী সহজ কথা রে। বলি কি, তুই সিমলের বাড়িতে চলে আয়। তোকে ঘিরে আবার আমরা আমাদের পুরোন সম্পর্কটাকে বাঁচিয়ে তুলবো। আমার কথা রাখ, কোন কষ্টই তোর হবে না দেখিস।'

সত্যি বলছি, ও বাড়ির অমোঘ আকর্ষণকে আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। আমার কেবলই মনে হ'ত, আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ ও বাড়িতেই কোথাও লুকোন আছে। এত বিশাল আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে নিজেকে এভাবে সকলের থেকে আড়াল করে রাখাটা উচিত নয়। মনে করেই একদিন সিমলের বাড়িতে চলে এলাম। কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে যা দেখলাম, তাতে চক্ষু স্থির হয়ে গেল আমার। প্রায় দু'লাখ টাকা ছাড়াও বিভিন্ন কম্পানীর শেয়ারের কাগজ-পত্র মিলিয়ে আমি প্রায় একটা ছোট-খাটো এস্টেটের মালিক। এত টাকা নিয়ে আমি কি করবো। এ যে সর্বনাশের পথ প্রশস্থ করার পক্ষে যথেষ্ট। সাউথের কলেজ থেকে নর্থে ট্রান্সফার নিয়ে আমি যেদিন প্রথম কলেজ করতে এলাম, সেদিনই আমার অরূপের সঙ্গে পরিচয় হল। একদিনেই কি মানুষ চেনা যায়? হয় তো যায় না। আবার দশ পনেরো বছর একসঙ্গে কাটিয়েও মানুষ মানুষকে চিনতে পারে না। এক মুহূর্তের চেনাটাই অনেক সময় এত নিখুঁত হয় যে, তাতে ভুলটা প্রায় হয়ই না বলতে গেলে। অরূপের ক্ষেত্রেও আমার তাই হয়েছিল।

আমি প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছি, সাউথের কলেজে যাদের সঙ্গ পেয়ে-ছিলাম তাদের মধ্যে কেমন এক ধরণের বাহ্যিক আড়ম্বর লক্ষ করেছি, হৃদয়ের উত্তাপ পাইনি বলতে গেলে। কেউ কেউ ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, চার্টার্ড এ্যাকাউনটেণ্ট কিংবা সরকারী, বেসরকারী অফিসের আমলাদের ছেলে। ওরা যে আমার নখেরও যোগ্য নয় সেটা কোনদিনই প্রকাশ করিনি। তার কারণ সম্ভবত আমার বাবা-মা। ওঁরা খুবই অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করেছেন। বিদেশী হাওয়া আমাদের এ বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে নি। ঠাকুর্দা বিদেশী শিক্ষায় কেতাদুরস্ত হলেও ঘরে ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন, ফ্রিজ নামক বস্তুটিকে ঠাকুর্দা এ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢোকান নি। বাবা-মা তো এ সবের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

বাবা বলতেন, 'দু'পা হেঁটে গেলেই যেখানে টাটকা মাছ, মাংস, তরিতরকারী পাওয়া যায়, তখন বাসি জিনিস খেতে যাব কোন দুঃখে। আমি তো সে দরের

মানুষ নই যে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুখে ফেনা তুলে ব্রাশ করবো। ও যারা করে করুক। আমার কিছু যায় আসেনা। সকালের হাওয়া গায়ে লাগাতে আমার ভালই লাগে।'

আমাদের এ বাড়িতে আধুনিকতায় মধ্যে ছিল ডাইনিং টেবিল আর ঠাকুর্দার জন্য কমোডের ব্যবস্থা। ওটা শুধু ঠাকুর্দাই ব্যবহার করতেন। আমরা সকলে টেবিল চেয়ার বসে শুকতো, শাকভাজা, ডাল, মাছের ঝোল খেয়েই তৃপ্ত হতাম। মাসে দু'দিন মাংস হত।

বাড়িতে রাধুনি থাকলেও মা-ই সব করতেন।

বাবা বলতেন, 'তুমিই যদি সব করো তো বসিয়ে বসিয়ে ওকে মাইনে দি কেন?'

মা হেসে বলেছিলেন, 'ঠাকুর রান্নার সব জোগাড় করে দেয়, আর কি জান, যত দিন সক্ষম থাকবো ততদিন এ অধিকারটা আমি কাউকে হাতছাড়া করবো না।'

ঠাকুর্দার সামনে এসব কথা হ'ত না ঠিকই। কিন্তু ঠাকুর্দা কেমন করে যেন এসব টের পেয়ে যেতেন! একদিন আমি খুব ছোট, ক্লাস সিক্সসে পাড়, ঠাকুর্দা সকাল বেলা মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'বউমা আজ ঠাকুরের হাতের রান্না খাব। আজ তোমার পুরো ছুটি।' বলেই হেসেছিলেন, বাবাও শুনে হেসেছিলেন কিন্তু মা'র মুখটা ভীষণ থমথমে হয়ে গিয়েছিল। ভরাট গলা করে মা বলেছিলেন, 'ঠাকুর কি পারবে?'

ঠাকুর্দা পান মুখে জর্দা ঢালতে ঢালতে বলেছিলেন, 'কিছু মনে করোনা, একটু মুখ পাল্টাব বউমা। দেখছনা, এখন কত বাড়িতে রান্না হয় না, বাইরের হোটেল রেস্তোরায় রাতের খাওয়া সেরে ড্রইংরুমে বসে চুটিয়ে গল্প ক'রে ঘুমোতে যায়। এরকম জীবন কার না ভাল লাগে বলো? একটু আধটু বৈচিত্র্য না থাকলে কী চলে?'

মা কথা বাড়ান না। আমি মনে মনে বেশ খুশি হয়ে ছিলাম, কিন্তু কী আশ্চর্য সেদিন ঠাকুর্দা বা বাবা কেউ-ই ভাল মতন খেতে পারেন নি।

পরের দিন মা বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজও কী ঠাকুর রান্না করবে?

'সেটা বাবাকে জিজ্ঞেস করো।'

মা কোন রকম দ্বিধা না করে ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আজও কী কালকের নিয়ম বলবৎ থাকবে?'

ঠাকুর্দা স্পষ্ট বলেছিলেন, 'ওসব তোমার দায়িত্ব বউমা। ঠাকুরের রান্না গলা দিয়ে আজ আর নাববে না।' বলেই সে কি হাসি!

মা'র মুখের রংই পাল্টে গিয়েছিল মুহূর্তে। সম্ভবত ওই বয়সেই আমি মাকে দেখে বুঝেছিলাম, সুখ আর শান্তি মানুষের মুখের চেহারা পাল্টে দেয়।

এ বাড়িতে এসে দিন কয়েকের মধ্যেই টের পেয়েছি, এখানে টিকে থাকতে গেলে পাঞ্জা কষতে হবে সমানে সমানে।

অরূপ আমার জীবনের স্বপ্নের সিঁড়ি। ওকে তাই কোনদিনই আমি ছাড়তে পারবো না। ও যে আমার কাছে কত গর্বের, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। মিঠুকে কথা দিয়েছিলাম, অরূপকে নিয়ে আমি ওদের ঘরে যাব। কিন্তু সেদিনের সেই ছুঁচোর ঘটনা আমার সাধকে অপূরণ করে রাখল। মাঝখান থেকে অরূপ সরাসরি মিঠুদের ঘরে বসে চা খাচ্ছে দেখে, মনে মনে সুখই পেয়েছি। মনে মনে হঠাৎই প্রতিজ্ঞা করে বসি, অরূপ হবে এ বাড়ির সর্বপ্রথম সর্বোত্তম পুরোহিত। যার পুজোয় এ বাড়ির দূষিত আবহাওয়া যাবে সরে। অরূপ ঘন ঘন এ বাড়িতে আসতে থাকে। আমি না থাকলেও চারুকাকীমার ঘরে গিয়ে বসে। একদিন ওকে আমি বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করি। এটাও ছিল আমার চালাকী। রান্নার দায়িত্ব দিয়েছিলাম চারু কাকীমাকে। সব রান্না নিভৃতে সেরে চারু কাকীমা বলেছিলেন, 'বুঝলে মৃদুল, এটা ঘুণাক্ষরেও যেন অরূপ জানতে না পারে। আমি বিস্মিত গলায় বলেছিলাম, 'তার থেকেও বড় ঝামেলা বাড়ির লোকগুলোকে নিয়ে।'

'ধ্যুস! ওদের অত পাত্তা দাও কেন?'

আমি চারু কাকীমার মনোভাব বুঝতে পারি এবং দুপুরে অরূপকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে জোর আড্ডা জমাই। বিকেলে চা পর্ব শেষে করে বাইরে বেরিয়ে বলি, 'আজ তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে অরূপ। এ ভাবেই নিজের অধিকার কেড়ে নিও।'

ও অবুঝের মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'তোমাকে সব সময় বুঝিনা মৃদুল? কিসের অধিকারের কথা বলছো।'

আমি বলি, 'জান অরূপ, আমার জন্মমুহূর্তে প্রকৃতি ছিল ভীষণ ভৈরবী। তাই বাবা-মা আমাকে তুফান বলে ডাকতেন। দেখে নিও, তোমাকে দিয়ে এই পচা-গলা মুখুজ্জে বাড়িতে আমি ঝড় বইয়ে দেব।'

অরূপ বলে, 'তা দেখাও, ভালই। কিন্তু কী জান, এতে বিপদের সম্ভাবনাও কম থাকে না।'

'বিপদ আছে জানি। ক্লীব, অপদার্থ কতগুলোকে অমি শায়েস্তা করলাম সামান্য ছুঁচো দিয়ে।' বলেই খুব মজার হাসি হাসি আমি।

'ওরা কিন্তু ধূর্তামিতেও কম যায় না। এটা ভুলে যেও না।'

সে কথার জবাব না দিয়ে আমি বলি, 'তোমার ওই 'প্রলেতারিয়েত' শব্দটার ওজন খুব। সেদিন দেবুদার ওখান থেকে ফিরে এসে, এ বাড়ির কাছে নিষিদ্ধ বই বাড়িতে ঢুকিয়েছি। আর খুব মন দিয়ে পড়ে বুঝেছি, দিন আগত ওই। ব্লু-ব্লাড এ বাড়ি থেকে উধাও করার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে তোমাকে সঙ্গে করে। সেই পুজোর পুরোহিত হবে তুমি। মিঠুকে তোমার কেমন লাগে?'

'বড় অসহায়।' অরূপ উত্তর দেয়।

আমি সহাস্যে বলি, 'তুমি সহায় হলেই, ওর অসহায়তা কেটে যাবে।'

অরূপ কিছুক্ষণ নিষ্পলক আমার দিকে চেয়ে থাকে। মৃদু হেসে বলে, 'একটু ভাবনার অবকাশ দেবে তো?'

'সময় কম। যা করার চটপট করে নিশ্চিত তীরে পৌঁছুনোই কী উচিত নয় অরূপ?'

অরূপ এবারও অপূর্ব ভঙ্গিতে হাসে। মুখ ফুটে কিছুই বলে না।

ওঁকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আমি টের পাই, আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ টের পাই।

কিন্তু এতটুকু বিচলিত হই না আমি। অত্যন্ত ঋজু ভঙ্গিতে বাড়িতে ঢোকার মুখেই বিজনদা, ঘণ্টু কাকা আমাকে ডেকে বলে, 'কোথায় গিয়েছিলি রে মৃদুল?'

আমি সামান্য রূঢ় গলায় জিজ্ঞেস করি, 'আমার সম্পর্কে তোমাদের এত কৌতূহল কেন?'

'বাড়ির ছেলে তাই।' বিজনদা পানের খিলি মুখে পুড়তে পুড়তে কথা-কটি বলে।

'অরূপকে পৌঁছুতে।'

এ উত্তরে ওদের হাসির কী থাকতে পারে বুঝিনা। ওরা ক্রমাগত হাসতে থাকে। এমন অশ্লীল ভঙ্গিতে ওরা হাসতে থাকে যা দেখে আমার গা গুলিয়ে

ওঠে।

আরও একটু কঠোর মনোভাব প্রকাশ করতে দোষ কী ? এই ভেবেই বলি, 'বয়সের তো গাছ পাথর নেই, ওসব হ্যা হ্যা মার্কা হাসি আমি যে পছন্দ করিনা তা নিশ্চয়ই জানো। যারা ওসব দেখে প্রশংসা করবে তাদের কাছে গিয়ে করলেই তো পার।'

ঘণ্টু একটু তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে বলে, 'বড্ড লপচপানি হয়েছে তোর। কাকে কী বলতে হয়, তা এখনও শিখিস নি।'

আমার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে মুহূর্তে। বলি, 'তোমার মত একটা গুয়েন্যাংলা মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে নাকি ? বেশি কথা বাড়িয়ো না, যা নিয়ে মজে আছ তা নিয়েই থাক। আমার চিন্তা তোমাদের না করলেই চলবে।'

বিজনদা আমার কলার চেপে ধরে কিন্তু এক ঝটকায় ওকে সরিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিয়ে বলি, 'বেশি বাড়াবাড়ি করলে, দাঁতগুলো সব খুলে ফেলবো।'

ঘণ্টুকাকাকে কেন্নোর মত গুটিয়ে যেতে দেখি।'

বিজনদা বলে, 'ফের ওই ছোঁড়াটা যেন এ বাড়িতে না ঢোকে।'

'তোমাদের বন্ধু-বান্ধবরা যদি এ বাড়িতে ঢোকে তো ও এ বাড়িতে ঢুকবে আমার বন্ধু হিসেবে।'

'আমার বন্ধুরা কেউ মেয়ে লটকাতে আসে না।'

আমি ওর মুখের ভাষা শুনে কিছুটা স্তম্ভিত হয়ে বলি, 'মুখে একটুও আটকায় না তোমাদের : তোমরা যা খুশি কর, একজন নিরীহ মেয়েকে নিয়ে, এসব করো না। বাড়ির মান-মর্যাদা যদি একটুও রাখতে চাও তো, ওসব কথা আর কখনো মুখে এনো না।' বলেই ওই ঘৃণ্য আবহ থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে হাঁপাতে থাকি। কী করবো কিছুই ঠিক করে উঠতে পারি না। সূর্যকান্তটা যদি মানুষ হ'ত, গণা কাকাও যদি একটু পুরুষের মত হ'ত, তাহলে কথা ছিল না। শুধু আমার আশার স্থল হচ্ছে চারু কাকীমা। আর কিছুটা পুলিন ও রঘুনাথ কাকা।

রান্নার লোকটাকে চা করতে বলে, ঈজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে থাকি। সময়ের পা দ্রুত এগিয়ে যায়। গরম চা এনে সেণ্টার টেবিলের ওপর রেখে কাজের লোক চলে গেলে আমি পরপর কয়েক চুমুকেই চায়ের পেয়ালা শেষ করে চারু

কাকীমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যতটা সম্ভব সংক্ষেপে একটু আগেকার ঘটনার বর্ণনাদি।

চারুকাকীমার মুখ মুহূর্তেই অন্য রকম হয়ে যায়।

ওঁর মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকি।

কপালে ভাঁজ ফেলে চারু কাকীমা বলেন, 'অত ভেঙে পড়ো না মৃদুল। মিঠুর চিন্তা আমাদেরই করতে হবে। সেখানে বাইরের কারুর খবরদারির আমি ধার ধারি না।'

'মিঠু যেন এ সবের কিছু জানতে না পারে। ও জানলে আমি ভীষণ লজ্জায় পড়ে যাব।'

চারু কাকীমা বলেন, 'ভাবছি অরূপকে নিয়ে। ও জানলে সে লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না। তুমি বরং ওকে কিছু ব'লো না। ও যেমন আসছে আসুক, অস্বাভাবিক আচরণ করলেই কিছু গোল বাধতে পারে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চারু কাকীমার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি।

কাউকে কিছু জানান না দিয়ে চোরবাগানের বাড়িতে অনেককাল পরে গিয়ে হাজির হই।

খবরটা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে। বয়স্ক মানুষজন সকলেই আমার চারপাশে ভিড় করে। এক সময় সুযোগ বুঝে রত্নেশ্বর কাকাকে নিয়ে নিভৃতে সব কিছু আলোচনা করি। সঙ্গে উমাপতিও ছিলেন।

রত্নেশ্বর আর উমাপতি একযোগে বলেন, 'তুমি বাড়ি যাও মৃদুল। এখন থেকে আমাদের লোক তোমাদের সর্বক্ষণ নজর রাখবে।'

বুকটা অনেক হাল্কা হয়ে যায়।

সেদিন অনেকরাত পর্যন্ত রেকর্ড প্লেয়ারে বিভিন্ন শিল্পীর গান শুনে মনে শুদ্ধতা এনে ঘুমোতে গিয়েছিলাম।

গণা কাকার কথা

দিনকাল এরকম হয়ে গেল কী করে? দিন নেই, রাত নেই, দুমদাম বোমা ফাটার শব্দ। পাইপগান, ধারাল অস্ত্র, রিভলবার নিয়ে এই সেদিন যাদের জন্মাতে দেখলাম, তারা সবাই হিংস্র হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজ খুলতে ভয় পাই। কাগজে রোজই খুনোখুনির, কুম্বিং অপারেশন হচ্ছে কোথায় না কোথায় তার সচিত্র সংবাদ দেখতে পাই। দেশটায় সত্যিকারের পুরুষ

মানুষ নেই নাকি? আমার কথা আলাদা। আমি পুরুষ হয়েও নিখাদ পরগাছা, বউয়ের আঁচল ধরা। সকলেই আমাকে গবেটভাবে, ভেরুয়া ভাবে। ভাবুক। তাতে আমার কি যায় আসে। আমি বেশ জানি আমাকে সবাই হিংসে করে। কেন ক'রে তা কী জানি না? চারুর মত বউ আমার। এ বাড়িতে কেন, সারা বাংলা দেশেও ওর মত সুন্দরী দ্বিতীয়টি আর নেই। আমি জিতে গেছি এখানেই। বাবার কাছে এ ব্যাপারে আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ। বাপের মত বাপ পেয়েছি আমি। চোরবাগানওলাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে আমার জন্য বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ করে চারুকে আমার বউ করে এনেছিলেন। চারুর কোন কষ্ট হোক, এ আমি কোনদিনই হতে দেব না। ওর সব চাহিদা আমি মুখ বুজে হজম করেছি। কেন করবো না? ওর কাছ থেকে যে সুখ আমি পাই, তা কী অন্য আর কারুর কাছ থেকে পেতাম? জানি না, আর জানতে চাই-ও না। শুনেছি পুরুষ মানুষের সুখ অর্থ, নারী আর যশে। তা কী সকলের কপালে জোটে! আমার যশ নেই বটে কিন্তু অন্য আর দুটো ব্যাপারে আমি যে কী পরিমাণ সুখী তা কি কেউ কোনদিন টের পাবে?

সুষ্যুর বলা সব ক'টা ঘোড়া বেইমানি করেনি। চার চারটে ঘোড়া সুষ্যুর কথা রেখেছিল, মাঝখান থেকে, ফক্কা করে দিল একটাই। যদি ওটা অমন বেইমানি না করতো তো একবেলাতেই আমি প্রায় সত্তর হাজার টাকার মালিক হয়ে যেতাম। এ কপালে জ্যাকপট আর জুটলো না বুঝতেই পারছি। তবে সুষ্যুর বাপতো আমি, পাটোয়ারি বুদ্ধি আমার কম নয়। প্রত্যেকটি ঘোড়াতেই আমি উইনের বাজী ধরেছিলাম। সাকুল্যে আমি যা ব্যয় করেছিলাম তা থেকে শ' দেড়েক টাকা আমার লাভই হয়েছিল। এই বা মন্দ কী। ফাঁকতালে দেড়শ' টাকা ক'জনের কপালেই বা জোটে। ট্যাক্সি হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতাম, কিন্তু তা করিনি চারুর ভয়ে। আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি চারু আমাকে ভালবাসে কী না! আর আমি, চারুকে ভয়ও পাই, আবার ভালও বাসি। আমার ভালবাসার ব্যাপারটাকে চারু কী ভাবে দেখে? সত্যিই যদি চারুর মত বউ আমার না হ'ত, তা হ'লে আমি কি এক নারীতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারতাম। আমার বাবা যে আমার মাকে ভালবাসেন নি তা নয় কিন্তু বেনারসের বাঈজি বাড়িতে যদি না যেতেন তো, ভালবাসার কথাই উঠতো না। কেন যে ওই অচেনা,

অদেখা মহিলাকে ভাল'মা ভাবি নিজেই জানি না। চারু মাঝে মাঝে ভালমাকে নিয়ে খোটা দেয় বটে, তাতে আমার কিন্তু বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ই না। বরং মনে মনে ভাবি, ভাগ্যিস বাবা এ'ধরণের একটা ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, নইলে চারু কী অত সহজে পোষ মানত! মেয়েজাতটা বড় আশ্চর্য প্রকৃতির। ওরা নিজের অংশ কখনো ত্যাগ করতে পারে না, আমার মত অপদার্থকেও চারুর মত মেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ও যদি কোনদিন কুলত্যাগ ক'রে অন্য কোন পুরুষের গাঁট ছড়া বেঁধে চলে যায় তা হ'লে আমার বেঁচে থাকাটাই মূল্যহীন হয়ে যাবে। আমি কি তাহ'লে সন্তুর মত হয়ে যাব! বাকী জীবনটা ওর মত দিন নেই রাত নেই, ভো-কাট্টা, ভো-কাট্টা করে ছাদে উঠে ওই রকম জন্তুদের মত চিৎকার, চেঁচামেচি করতাম? ও বাবা, ও রকম জীবন আমার যে অসহ্য! আর যাই হই, সন্তু হতে চাই না। ও আমার কাছে দুঃসহ, দুঃস্বপ্নের মত। বিশেষ করে মিঠুকে নিয়ে পড়বো ঘোর বিপদে। সুষ্যুকে নিয়ে বেশি ভাবি না, যা রেখে যাব, যদি একটু হিসেব করে চলে তো ওর জীবন কেটে যাবে। কিন্তু সে সম্ভাবনা খুবই কম। আবার ভাবি সুষ্যুটা কম ধড়িবাজও নয়। একধরনের মানুষ আছে যারা ওপরেরও খায়, আবার তলারও কুড়োয়। ও হচ্ছে সেই প্রকৃতির, এটা আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। ইদানীং ওর ঘন্টুটার সঙ্গে ভাব হয়েছে। ঘন্টুকে ঘোল খাওয়াবার বুদ্ধি ওর আছে, এতে আমি নিঃসন্দেহ। এই সব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি বাড়ি এসে পৌঁছুই। মাঝখানে ভেবেছিলাম, গণেশটাকিজের কাছে নাববো। জুতসই এক গেলাস সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে দিলখোস মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরবো। তা আর হ'ল না। বোমবাজির ব্যাপারটা মাথা থেকে সরাতে পারি না। সিদ্ধির নেশা মাথা থেকে কর্পূরের মত উবে যায় মুহূর্তেই।

বাড়ি এসে দেখি, ঘর অন্ধকার করে চারু শুয়ে আছে। মিঠু ওর পড়ার ঘরে। আমাকে দেখেই মিঠু এগিয়ে এসে বলে, 'মা'র মন মেজাজ ভাল নেই, একটু সাবধানে কথা ব'লো।'

ফ্যাল ফ্যাল করে মিঠুর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কী কারণে চারুর মন খারাপ তা জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না।

মিঠু বলে, 'তুমি বেরোবার একটু পরই মা বেরিয়েছিলেন। ফিরে এলেন থমথমে মুখ নিয়ে। যা কোনদিন করেন না, তাই করলেন। স্নানের ঘরে গেলেন। যে অবস্থায় ছিলেন সব সমেত চান করে ভেজা কাপড়ে বেরিয়ে এসে শুকনো জামা

কাপড় চেয়ে নিলেন। সে সব পরে, গম্ভীর মুখে আমাকে চা করতে বললেন। আমার কেমন যেন খট্‌কা লাগছে।'

আমি বাক্‌হীন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মিঠুকে ভাল করে দেখে বলি, 'কোথায় যায়, জানিস ?'

মিঠু ম্লান হেসে জবাব দেয়, 'তুমিই যখন জান না, আমি জানবো কী করে ?

চারুর ঘরে ডিম লাইটটা পর্যন্ত নেভান। আশ্চর্য হই এই ভেবে, চারু কোনদিনই ঘুটঘুটে অন্ধকার সহ্য করতে পারে না। আজ ওর কি এমন হ'ল যে, এমন করে সকলের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখছে ? মিঠুর কথা শোনার পর থেকেই ভয় আমার বুকে খামচে বসে আছে। এমনটা হবে কেন আমার ? ওর আমি স্বামী, তাহলে কেন আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারছি না ?

চারু একদিন বলেছিল, 'তোমার আমি বিয়ে করা বউ। 'বিবাহ' শব্দের মানেটা কী তুমি বোঝ ?'

গাঁড়লের মত মুখ করে চারুর দিকে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'ওসব মানে-টানে আমার মাথায় ঢোকে না।'

সে কথা শুনে চারুর কি হাসি ! আমি আরও বেশি অবাক চোখে চারুকে দেখছিলাম। হাসুক গে, আমি যদি সারাজীবন ও হাসি দেখে যেতে পারি তো আমার মত সৌভাগ্যবান আর ক'জন আছে।

চারু হঠাৎই হাসি থামিয়ে বলেছিল, 'আচ্ছা তোমার কি মনে হয় কতগুলো মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে, আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই যথার্থই বিয়ে হয় ? যে মন্ত্রের অর্থও অনেকে বোঝে না, তা উচ্চারণ করার মধ্যেই কি সবকিছু নির্ভর করে ?'

আমি ফট্ করে উত্তর দিয়েছিলাম, 'সমাজে এই নিয়মই তো চলে আসছে। কতজন ও নিয়ে মাথা ঘামায় বলতে পার ?'

চারু দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে ছিল। শুধু বলেছিল, 'সেটাই তো সবচেয়ে দুঃখের'।

কেন যে চারু এসব কথা তুলেছিল আর কেনই বা আজ ওই কতকালের পুরোন কথা আমার মনে পড়ে গেল, বুঝি না। কেমন গোলক ধাঁধায় পড়ে যাই আমি।

জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধোয়ার জন্য কলঘরে চলে যাই। যাওয়ার সময় দেখি মিঠু খাতায় কী সব আঁকিবুকি কাটছে। যে যা করে সুখ পায়, করুক'—আমি হচ্ছি সেই ধরনের মানুষ। আহারে ! আজ যদি শেষ ঘোড়াটা

অমন ছ্যাঁচড়ামো না করতো, তো চারুকে আমি টাকা দিয়ে ঢেকে দিতে পারতাম। এই দুঃখ আমার কোনদিনই ঘুচবে না। শেষ টার্নিংয়ে ঘোড়াটা অমন করে মার খাবে ভাবিনি। বেশ কিছুক্ষণ ওই দৃশ্য আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ঝুলে রইল। একটু পরে মিঠুর গলা পেয়ে সংবিত ফিরে পেলাম।

মিঠুকে বললাম, 'হয়ে গেছে। আর দু'মিনিট।'

ওটা কথার কথা। মিনিট পাঁচেক লাগল কলঘর থেকে বেরিয়ে আসতে।

মিঠু বলল, 'তুমিই বা কি করছিলে এতক্ষণ ওখানে। কখনো তো তোমার এত সময় লাগে না।'

আমি ক্যাকাশে হেসে উত্তর দি, 'কলঘরে খুব আরশোলার উপদ্রব হয়েছে। ওগুলোকে আজই খতম করবো ঠিক করেছি।'

মিঠু হেসে বলে, 'এ বাড়িতে ছুঁচো, আরশোলা, চামচিকে অসংখ্য। কোনটাকে সরাবে? ওদের হঠাতে গেলে ছোটখাটো একটা যুদ্ধ করতে হবে, তা জান?'

মিঠুর কণ্ঠস্বর ঠিক ওর মা'র মত। বেশ লাগে শুনতে। মুখোমুখি বসে নিবিষ্ট চোখে দেখি। মন জুড়িয়ে যায়। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলি, 'আর এক কাপ বেশি করলে পারতিস। তোর মাকে দিয়ে আসতাম।'

মিঠু মুখ টিপে হাসে। বলে, 'মা কখনো দুবার চা খেয়েছেন?'

তাইতো। চারু কখনো সকাল-বিকেল ছাড়া চা খায় না। এটা জেনেও কেমন যেন জোর দিয়ে বলি, 'আজ ওর শরীর বা মন খারাপ; চা পেলে হয়তো······'

ঠিক সে সময়ই চারুর ঘরে আলো জ্বলে উঠল, আমরা দুজনই ওই ঘরের দিকে একসঙ্গে চোখ ফেরাই।

চারু উঠে আলমারি খোলে। একটা ছোট্ট চন্দন কাঠের বাক্স বের করে তার ডালা খোলে।

বাড়িতে আমাদের উপস্থিতির কোন মূল্যই দেয় না চারু। ও নির্বিকার ভঙ্গিতে সেই চন্দন কাঠের বাক্সটা থেকে একটা মোটা ডাইরি বের করে পাতার পর পাতা ওল্টাতে থাকে। একসময় আমরা দেখি, ডাইরির পাতাগুলো সব ছিঁড়ে কুটিকুটি করছে। সব পাতাগুলো ছেঁড়া হলে, চারুকে কাঁদতে দেখি।

আমার কিছু বলা বা করা উচিত কিনা এনিয়ে আমি বিরাট ধন্দে পড়ে যাই।

চারু ওই কাগজের টুকরোগুলোকে এক সঙ্গে জড়ো করে রান্নাঘরে ঢুকে

তাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। সর্বগ্রাসী আগুন মুহূর্তেই সবকিছুকে ভস্মীভূত করে। চারু সেই পোড়া কাগজগুলোকে সন্তর্পণে এক সঙ্গে জড়ো করে একটা কৌটোয় ভরে রাখে।

মিঠু আর আমি পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকি।

চারুর এ ধরণের আচরণের পেছনে কি কারণ থাকতে পারে জানি না, বুঝে উঠতে পারি না।

চারু ভস্মাধারকে ফের ওই বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে আলমারি বন্ধ করে দেয়।

আমি ওর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করি, 'তোমার কী হয়েছে চারু?'

চারু আমাকে দেখে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। খুব সহজ ভঙ্গিতে বলে, 'নাহ্! কিছু না তো?'

'তাহলে তুমি ওসব কী করলে?'

চারু ম্লান হাসল, বলল, 'সময় এলে সব জানতে পারবে। তোমাকে কিছুই গোপন করবো না।'

আমিও ওকে আর পীড়াপীড়ি করি না কিংবা ভরসা পাইনা। শুধু বলি, 'তোমার শরীর খারাপ, এ অবস্থায় রান্না ঘরে আজ আর যেয়ো না।'

চারু হ্যাঁ-না কোন উত্তরই দেয় না।

মিঠু বলে, 'আজ আমিই না হয় রান্না করি মা।'

চারু বলে, 'বেশ তাই কর। এখন থেকে আরও অনেক কিছুই তোকে নিজের হাতে করে নিতে হবে।'

আমি সরল ভঙ্গিতেই বলি, 'তুমিই না বলতে, উনুনের আঁচে মিঠুর রং নষ্ট হয়ে যাবে। আজ তুমিই ওকে এসব করতে পাঠাচ্ছ। বরং আমি বলি কি, 'আজ হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসি। মাঝে মাঝে মুখ পাল্টান ভাল, তাই না চারু?'

চারু সে কথা শুনে বলল, 'মানুষ যা ভাবে তা কী সব ঠিকঠাক হয়, হয় না। আমার মনে হয়, সেজন্যই জীবনের ধারাটাও পাল্টান প্রয়োজন। তাছাড়া আজ আমি কিছু খাব না।'

'কেন? খাবে না কেন?' প্রশ্ন করি আমি।

'আজ খেতে মন নেই। কোন কিছুই আজ আমার গলা দিয়ে নামবে না।'

'কেন বলবে তো?'

চারু রুদ্রমূর্তি ধারণ করে বলে, 'সব কিছু জানতে চেয়ো না। বলেইছি তো

সময় এলে তোমাকে কোনকিছুই আমি গোপন করবো না।' বলেই চারু মিঠুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'যা পারিস বুদ্ধি খাটিয়ে আজ রান্না করতো ?'

মিঠু বলে, 'এই প্রথম তুমি আমাকে এতবড় দায়িত্ব দিলে, আর তুমিই খাবে না।'

চারু এইপ্রথম বেশ সুন্দর ভঙ্গিতে হাসে। বলে, 'তাতে কী হয়েছে। তোর বাবা, আমার কষ্ট হবে জেনে রাঁধুনি রাখতে চেয়েছিল, আমিই দেই নি। কেন জানিস, পরমুখাপেক্ষী জীবন, জীবনই নয়। তাছাড়া নিজের হাতে রান্না করে বাড়ির সকলকে খাওয়ানোর মধ্যে একধরণের সুখ আছে। সে সুখ যে কী তা আমাদের মত মেয়েরা ছাড়া বুঝবেই না। আমার জন্য ভাবিস না। শুধু আজকের দিনটার জন্য তোকে আমার কথা শুনতেই হবে।

সুষ্যু যে কোথায় ছোঁচামি করছে কে জানে। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওকে আচ্ছাসে জুতো পেটা করি। কিন্তু পারি না। ওকে দেখে কেমন যেন মায়া হয়, তাতেই আমার রাগের ঝাঁঝটা যায় কমে। সুষ্যুতো আজ আমাকে প্রায় স্বর্গের সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল বলতে গেলে। ইস্ একটুর জন্যে আমার সব সাধ অপূর্ণ থেকে গেল। আমি যে কী ধাতুতে গড়া তা আমি নিজেই বুঝিনা। কেননা, সুষ্যুর উপরে রাগও হয়, আবার মায়াও হয়। সত্যি যদি আজ আমি অতগুলো টাকা পেয়ে যেতাম তো, চারু কী করলো না করলো সেদিকে মন দেবার অবকাশই থাকত না। এখন আমি চারুকে নিয়ে পড়েছি সমস্যায়। আমাদের ছাব্বিশ সাতাশ বছর বিবাহিত জীবনের মাঝে চারুকে কখনও এমন উদ্ভট আচরণ করতে দেখি নি। অনেক কষ্টে যদিও বা ওকে কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম, তা চারু এমন ভাবে সেটাকে দূরে সরিয়ে দিল যে হয়ে উঠলাম বড় রকমের বেওকুফ।

মিঠুকে রান্না ঘরে খুব তৎপর দেখি। চারু উঠে এসে কি দিয়ে কী করতে হবে সে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। রান্না ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই যা বলার বলে যাচ্ছিল।

সুষ্যু এল ঘণ্টা খানেক পর।

চারু শুধু ওকে আপাদমস্তক দেখে প্রশ্ন করলো, 'কোথায় থাকিস সারাদিন ?'

সুষ্যু কোন জবাব দেয় না। পায়জামা পাঞ্জাবি ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'কে যে কোনদিন কোথায় খতম হয়ে যাবে কে জানে।'

'এসব কি কথা ?'

স্থষ্যু উত্তর দিল, 'পান্না বাবুর ছেলে নীলুকে তো চেনো।

'হ্যাঁ, তা কি ?'

'নীলুটার বেঘোরে প্রাণ গেল। পাইপ গানের গুলিতে অতসীর ভাইটা ওকে সাবার করে দিল সকলের সামনে।' আমি আতঙ্কিত মুখে জিজ্ঞেস করি, 'তার মানে তুই দেখেছিস ও সব।'

স্থষ্যু বলল, 'দেখেছি, আবার দেখিও নি। তোমাদের বললাম বলে কী আর কাউকে একথা বলবো ভেবেছ।'

'আমিও ওর কথায় সায় দিয়ে বলি, 'বুঝলি স্থষ্যু, মুখে কুলুপ এঁটে থাকবি। এবার মিঠুকে লক্ষ করে বলি, 'স্থষ্যুকে একটু চা দেনা।'

স্থষ্যু অমনি বাধা দিয়ে বলে, 'তুমি খেতে চাও খাও, আমার ওসব ভাল্লাগে না।'

মনে মনে বলি, হারামজাদা কেন ভাল লাগে না, তা কি আমি বুঝি না। কটা মোদকের গুলি পেটে সেধঁান আছে রে। জিজ্ঞেস করবো করবো করেও, ওসব কথা মুখ ফুটে বলতে পারি না। স্থষ্যু মুখহাত ধোবার জন্য কলঘরে চলে যায়।

আড় চোখে চারু কী করছে দেখার কৌতুহল ত্যাগ করতে পারি না। ঠিক আগের মতই ভঙ্গিতে চারু চোখের ওপর বা-হাত ছড়িয়ে শুয়ে আছে। গলায় কাঁটা বেঁধার অবস্থা আমার। নিজেরই ঘর, অথচ, ভীষণ অচেনা ঠেকে কেন যেন। ওই যে 'পরবাসী' না কি বলে, তাই বুঝি হয়ে যাচ্ছি আমি।

স্থষ্যু গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'চল না, সবাই মিলে দেওঘর ঘুরে আসি। এখন তো ও বাড়িটা খালিই পড়ে আছে। এই একটু আগে নারান জেঠু কুইনকে নিয়ে ফিরে এল! কী জেল্লা কুইনের, যেন হিন্দি সিনেমার নায়িকা।'

ওর কথা বলার ঢং এমন যে রাগ হয় না, হাসি পায়। তবু চারু ঘরে আছে জেনে হাসতে ভরসা পাই না।

ওর কথাটা বোধহয় চারুর কানে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্থষ্যুকে বলল, 'কুইন কখন ফিরল বলছিস ?'

স্থষ্যু উত্তর দিল, 'সকালে ফিরেছে। তারপর সারাটাদিন হাওড়ায় ওর মামার বাড়ি ছিল, সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরল।'

চারু শাড়ি পাল্টে যেতে যেতে বলল,' আমি একটু ওদের ঘর থেকে ঘুরে

আসি।'

সুষ্মু বলল,' কেন যাচ্ছ? ফের দুটো কথা উঠবে।'

চারু গম্ভীর মুখ করে বলল, 'সব ব্যাপারে তোকে না কথা বলতে বারণ করেছি।'

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলি, 'সুষ্মুর কথায় অত গুরুত্ব দিলে চলে। যাও, দেখে এসো ওদের। শত হলেও বাড়ির মেয়ে, ভাল-মন্দ তো আমাদেরই ভাবতে হবে।'

শেষের কথাগুলো চারু শুনতে পেল কিনা বুঝতে পারলাম না।

সুষ্মুও খুব হাল্‌কা হয়ে গেল মুহূর্তে। বলল, 'তুমি আজ প্রায় কেল্লাফতে করেছিলে বাবা! এক চুলের জন্য বাজী মাত করতে পারলে না।'

ওকে চোখ মটকে ইশারা করি থামতে।

সুষ্মুর ঘটে সে বুদ্ধিটুকু আছে। ও সেয়ানার শিরোমণি।

জিজ্ঞেস করি, 'হঠাৎ দেওঘর যাওয়ার কথা বলছিস কেন?'

সুষ্মু স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে বলে, 'আমাদের খুব ডেঞ্জার আছে বুঝলে বাবা। দালাল হলেই ওসব পার্টির লোক কী সব ভাষা বলে। তুমিও তো দালালি কর, কোনদিন হয় তো ঘিচুং করে ছাড়বে তোমাকে।'

বুকের ভেতরে দমকা ভয় হুর হুর করে ঢুকে যায়, ফলে মুহূর্তেই ঠাণ্ডা মেরে যাই আমি। হাত-পা কাঁপতে থাকে। বলি, 'কী বলছিস যা-তা।'

'ওই যারা পাইপগান নিয়ে ঘোরে ওরা না সব আমাদের কেমন ঘেন্না করে। বাস্টার না কী সব বলে। বুঝি না। ওদের ধারণা এ বাড়িতে অনেক খোঁচর আছে। তাই বলি কি, মাস কয়েক ওখানে কাটিয়ে আসি।'

'ঠিক আছে। তোদের মা-কে বলবো'খন' আমি উত্তর দি।

মিঠু রান্না করছিল। বাতাসে মশলাপাতির গন্ধ আসছে। সুষ্মুই বলল, 'আজ হঠাৎ মিঠু রান্না করছে যে বড়?

'তোর মা'র শরীর খারাপ। এতক্ষণে মাত্র দু' চারটে কথা বলেছে। কি হয়েছে, জানি না। জিজ্ঞেস করেছিলুম, বলল সময়মত সব জানাবে। তাই আর বেশি ঘাঁটাই নি। বল, ভাল করি নি?'

সুষ্মু সহাস্যে উত্তর দিল, 'এ সব ব্যাপারে তোমার মাথা সাফ।' কিছুক্ষণ থেমে ফের বলল, 'মৃদুলদাকে নিয়ে এ বাড়িতে শিগ্‌গির ঝামেলা বাঁধবে। ও শালারা সব ওর নামে ফিসফাস, গুজগুজ করছে সারাক্ষণ। আর বাইরে

আমার বয়সী ছেলেরা দেশ দেশ করে চেল্লাচ্ছে। সকলে এত দেশের চিন্তা কী যে করছে বুঝি না। খাওয়াদাওয়া কর, ঘুমো, ফুর্তি মার, তা না খালি শ্লোগান আর শ্লোগান, মিছিল আর মিছিল।' আমি উত্তর দি, 'সেটা তো আমার মাথাতেও ঢোকে না সুষ্যু। বড়বাজারে গতকালই তো একজন সুদখোরের গলা কাটা হল, স্কুল-কলেজে সব তুবড়ি ফাটছে। সাধ মিটিয়ে যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াব তার উপায় নেই। বাসগুলো যখন যেখান দিয়ে পারছে সুটসাট ঢুকে পড়ছে। সকলেই যদি দেশপ্রেমী হয় তো চলবে কী করে?'

সুষ্যু সমর্থনের ভঙ্গি করে বলে, 'সেটা তো আমিও বুঝি না। দেয়ালে দেয়ালে কী সব লেখা, গর্জে ওঠো, গর্জে ওঠো। কেন যে মিছিমিছি গর্জে উঠবে বুঝি না। থাক গে, মা এলে সুযোগ বুঝে কথাটা পেড়ো। মাকে নিয়েই হয়েছে যতো গেড়ো। সব সময় স্কুলের বড়দিদিমণি দিদিমণি ভাব। মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায় মাকে। বড় অচেনা লাগে।'

ও তো সুষ্যুর কথা নয়, এ যেন আমারই মনের কথা। ভয় আমাকেও পেয়ে বসে। আজ যে করেই হোক, চারুকে সব বলবই।

মিঠুর রান্না শেষ হল যখন, চারু ঘরে ঢুকল। আমাদের কারো দিকে ভাল করে নজরও করল না। ঠিক আগের মতই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল।

কি আশ্চর্য রাত আটটার কাছাকাছি চারুর দাদা শ্যামাচরণ বাবু এসে হাজির। বেশ মনে করতে পারছি, এই নিয়ে শ্যামাচরণ বাবু তিনবার এ বাড়িতে এলেন।

ওঁর সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলবো? এত বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোকের সঙ্গে সঙ্গত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বেশ উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে চারুকে লক্ষ করে বলি, 'দ্যাখো দ্যাখো কে এয়েছেন?'

চারু যেন অনেক দূর থেকে উত্তর দিল, 'কে এল আবার!'

শ্যামাচরণ বলল, 'আমি রে চারু, আমি।'

'কে? দাদা? আয় আয় ঘরে আয়।' বলেই আলো জেলে দিল।

শ্যামাচরণ ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে চারুর একেবারে গা ঘেঁষে বসলেন।

চারু ওর মুখের দিকে স্থির চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। পরে এক সময় শ্যামাচরণের বুকে মাথা রেখে খুব কাঁদলো।

আমি এ ঘর থেকেই দেখলাম, চারুর কান্না থামানর কোন চেষ্টাই শ্যামাচরণ

করলেন না, বরং যতক্ষণ ও কাঁদতে পারে কাঁদুক এই মনোভাব নিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন।

চারু এক সময় থামল। শ্যামাচরণের দিকে চেয়ে বলল, 'জানতাম তুই আসবি। আমাকে কখনও ভুলতে পারবি না।'

শ্যামাচরণ বললেন, 'কাউকেই ভুলতে পারি না। তুই শেষ পর্যন্ত জিততে পারলি না দেখে নিজেকে আর কিছুতেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না।' সামান্য সময় চুপ করে থেকে একটু ইতস্তত করে বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। সবই ভাগ্য। হ্যাঁ শোন, আমার ওই প্রতিষ্ঠানে আরও সাত আট-জনকে সংগ্রহ করেছি। হাজার দুয়েক টাকার দরকার। জানি এ সময় এ'সব বলা শোভন নয়, তবুও না বলে উপায় নেই। যেদিন বুঝবো, ওরা পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেয়েছে, সেদিন আমিও নিঃশব্দে সরে যাব। তোর মতন মেয়ে যদি এ দেশের ঘরে ঘরে জন্মাত তো কোন দুঃখ ছিল না। বাবার শরীর ভেঙে গেছে। তবুও সংস্কারকে ছাড়তে পারছেন না। আমাদের ছেলে ঋত্বিক তোদের কাউকেই চেনে না। আপনজন যারা তাদের না চেনাটা খুব দুঃখের। অথচ, আমার কিছুই করার নেই। তোদের দেখে বেঁচে থাকার যে কী সুখ তা বুঝতে পারি। দেরি করার সময় নেই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আমাকে ট্রেন ধরতে হবে। যদি সময় সুযোগ পাস তো চলে যাস আমার ওখানে। বড় ভাল লাগবে, মনে শান্তি পাবি।'

স্বপ্নোত্থিতের মত দৃষ্টি চারুর।

ভাই-বোনের এরকম সুসম্পর্ক আমার প্রায় অজানা।

সূর্যকান্ত বলল, 'মামা চিরকালই কেমন যেন, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওঁকে আমাদের মত লোক চিনতে পারে না।'

চারু এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। বলে, 'হাজার দুয়েক টাকার দরকার এখুনি?'

অতগুলো টাকা চারু এক সঙ্গে চাইল, আমি কারণ জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলাম না। চাবির তোড়া হাতে দিয়ে বলি, 'ওঁকে আজ এক রাত্তিরের মত থাকতে বল না?'

চারু ম্লান হেসে বলল, 'কোন লাভ নেই। তাই বলবো না।'

বললাম, 'জানি না। অত টাকা আছে কী না। নিজের চোখেই দেখো।'

চারু বলল, 'নেই যখন তখন দেখে লাভ কী। বরং কবে নাগাদ দিতে

পারবে বললে আমি না হয় সেইমত ওঁর কাছে টাকা পাঠিয়ে দিতে পারি।'

চারুর আমার প্রতি এই যে বিশ্বাস, তাতে আমি অভিভূত না হয়ে পারি না।

চারু নিজের আলমারি খুলে বেশ কিছু টাকা ওর দাদার হাতে দিয়ে বলল,' দু'একদিনের মধ্যেই বাকী টাকা পেয়ে যাবি।'

শ্যামাচরণ বাবু উঠে যাবার সময় আমাদের সকলকে ভাল করে দেখলেন। শুধু মিঠুর দিকে চেয়ে বললেন, 'ভালভাবে থেকো। পার তো মাকে নিয়ে আমার ওখানে একবার যেও।'

শ্যামাচরণবাবু ধীর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেলেন।

চারু অনেকদিন পর বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্যামাচরণবাবুকে যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ নির্নিমেষে দেখল। এই প্রথম বুঝি আমি পবিত্র সম্পর্কের ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারি।

মুখুজ্জে বাড়ির ভাই বোনদের মধ্যে কী ধরণের সম্পর্ক তা তো আমার অজানা নয়। নিজেরও তো বোন আছে। কই ওদের সঙ্গে তো আমরা কেউ-ই এমন ব্যবহার করতে পারি না। বুকের ভেতরটা হঠাৎই ভারি হয়ে ওঠে। নিজেকে বড় ছোট, নীচ মনে হয়।

চারু সত্যি কিছু খেল না।

মিঠুর হাতের রান্না যে এত সুস্বাদু তা এর আগে কোনদিনই টের পাইনি। চারুকে শুনিয়েই বললাম, 'তুমি খুব ঠকলে চারু।' সে কথা শুনে বেশ প্রসন্নই দেখাল চারুকে।

চারু বেশ সহজ হয়ে বলল, 'তোমরা জিতলেই আমার জিত। আর জানই তো, সকলে জেতবার জন্য জন্মায় না। আমি ঠকেছি বলে দুঃখ নেই, তবে মিঠু যেন জিততে পারে, এটা মা হয়ে আমি যেমন কামনা করি, বাপ হয়ে তুমিও তাই কামনা ক'রো।'

অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না। চারুও জেগে আছে টের পাই।

খুব আদর করে ওকে কাছে টেনে এনে বলি, 'কি হয়েছে চারু? তোমার কষ্ট যে আমার কষ্ট তা কী জাননা?'

চারু আলো আঁধারীর মধ্যে অশ্রুসিক্ত চোখে আমাকে আঁকড়ে ধরে বলে, 'খুব বড় হার হয়েছে আমার আজ।'

'কী বলছো তুমি? কে তোমাকে হারাল?' আমি জিজ্ঞেস করি।

চারু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার ভাগ্য, বলেই বেশ কিছুক্ষণ আমাকে জড়িয়ে কাঁদলো। পরে চোখের জল মুছে বলল, 'আমার সব কথা শোনার পর জানিনা, তুমি আমাকে কী চোখে দেখবে।'

আমি বলি, 'তোমাকে নিয়ে আমার যা গর্ব তা কোনদিন কেউ নষ্ট করতে পারবে না।'

চারু বলে, 'মন্ত্র পড়ে তোমাকে স্বামীত্বে বরণ করেছি, তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ করেছি। কিন্তু মনে মনে একজনকে আমি ভালবাসতাম। ওর নাম হিমাদ্রি। মৃত্যু আজ ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। শুধু একা আমি ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। তোমার কাছ থেকে মাস মাস টাকা নিয়ে ওর বেঁচে থাকার সংগ্রাম করেছি। তুমি গোবেচরো, ভালমানুষ, কোনদিন আমাকে সন্দেহ করনি। ভালবেসে যাকে মনে ঠাঁই দিয়েছি, তার জন্য না হয় একটা রাত উপোস করে কাটালাম। জানি না এতে হিমাদ্রির আত্মা শান্তি পাবে কী না। তবুও আমার ধারণা, ওর আত্মা আমাকে সর্বক্ষণ নজর করছে, করবে।' বলে ও গাঢ় করে শ্বাস ফেলে।

আমি ওকে মুখের কথা বলি না, মনের কথাই বলি। 'ওসব নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কিছু নেই। রক্ত মাংসের মানুষের কত কিছুই হতে পারে। পুরুষের ক্ষেত্রে যদি এ ধরণের ব্যাপার দোষের না হয় তো মেয়েদের ক্ষেত্রেই বা তা হবে কেন?'

এতদিন আমি চারুর পায়ে হাত দিয়েছি। আজ চারু আমাকে আরও নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, 'একটু মাথাটা তুলবে?'

'কেন গো।'

চারু আমার পা দু'টোতে মাথা রেখে চোখের জলে ভেসে যেতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ ও ওইভাবে থেকে বলে, 'এতদিন বড় উপেক্ষা করেছি তোমায়। সব মুখ বুজে সহ্য করেছ। হিমাদ্রি চলে গেল বলেই বুঝি তোমাকে সত্যিকারের আমি চিনতে পারলাম।'

আমি চারুর মনোভাব ঠিক ঠিক বুঝতে পারি। আমি মুখ ফুটে কিছু বলি না বটে, তবে চারুর যে রূপ আমি আজ প্রত্যক্ষ করলাম তাতে গর্বিত হওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। অবশ্য এটা ঠিকই, চারুকে আমি একটা দিনের জন্যও সন্দেহ করিনি। ওতো সব কিছু যেমন গোপন করে যাচ্ছিল, ঠিক তেমনি গোপন করে যেতে পারতো। তবে কেন ও আগ বাড়িয়ে

এসব কথা আজ বলল? চারুকে কি ঠিক আগের চোখে এবার থেকে আমি দেখতে পাব?

ঠিক এসময় চারু বলল, 'বিশ্বাস করো আমার এ শরীর পবিত্র। এখানে কিন্তু তোমাকে আমি প্রতারণা করি নি। অবশ্য এ সবই তোমার বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। যদি মনে কর, আমাকে তাড়িয়ে দিতে পার, আবার যেমন মর্যাদা দিয়ে ঘরে রেখেছ এতকাল, তেমনি রাখতে পার।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দি, 'ছি চারু, ওসব মুখেও এনো না। তুমি আমার সন্তানের মা, এত বছর ধরে তুমি আমার ঘর করছো, ইচ্ছে হলে সব চুরমার করে দিয়ে যেতে পারতে, কিন্তু সে সব তুমি কর নি। সত্যিই বলছি আমি অপদার্থ, আমাকে যা তুমি দিয়েছ, তার জন্য কী এতটুকুও কৃতজ্ঞতাবোধ আমার থাকবে না। বাবা মাকে ছেড়ে বেনারসের বাঈজির সঙ্গে জীবন কাটিয়েছেন; আমি সেটা মনে মনে মেনে নিতে পারি নি। বাবাকে সমালোচনা করা উচিত নয়, তবু বলছি, আমি বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারি নি। আর তোমাকে শুধু ভালও বাসি না শ্রদ্ধাও করি। কেন করি জান, তোমার শিক্ষা, রুচি আর মুক্ত একটা মন আছে। আমি টাকা আর তোমাকে ছাড়া কিছু জানি না। বাপ হয়ে ছেলের কাছ থেকে ঘোড়ার খবর নি, আজ গিয়েও ছিলাম। হেরে গেছি। আর পাটের ব্যবসাও দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কম্পিটিশানে নাইলন এসে গেছে। সকলেই ওদিকে ঝুঁকছে। জানি না, কতদিন আর ওই শেয়ারগুলোকে আটকে রাখব। তোমাকে এসব বলছি। তার কারণ, তুমিই আমাকে সৎ উপদেশ দেবে। মিঠুর জন্য ভাবি না, আমার যদি তোমার আগে কিছু হয়ে যায় তো তুমি যাতে পথে না বসো, তার চিন্তা আমাকে বড় বেশি অসহায় করে তোলে।'

চারু সে সব শুনে বলে, 'জানতাম তুমি আমাকে ভুল বুঝবে না। ও সব টাকা, ব্যবসার কথা থাক। এখন একটু ঘুমোও।' চারু আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করি, 'তোমার দাদার শরীরটা ভীষণ ভেঙে গেছে। কী উজ্জ্বল চেহারা ছিল।'

চারু বলল, 'তার জন্য আমার বাবার অর্থহীন সংস্কার দায়ী। বাবা যদি দাদাকে স্বীকার করে নিতেন, তাহ'লে, ও বাড়িটাও একটু সুখের মুখ দেখতে পেতো। তাই আমিও মিঠুর ব্যাপারে মনে মনে একটা বিষয় স্থির করেছি।

জানি না তুমি এতে সম্মতি দেবে কী না।'

আমি সামান্য হেসে বলি, 'ভুল তুমি করবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। কী ব্যবস্থা করবে, বলবে ?

চারু বলে, 'নির্ভয়ে বলবো ?'

'নিশ্চয়ই'।

চারু বলে, 'এ বাড়িতে তো অনেকেই আসে, ওদের মধ্যে কাকে তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে বলনা ?'

আমি স্পষ্ট জবাব দিই, 'এবাড়িতে তো কত লোকই আসে, ওদের ভাল করে নজরই করি না।'

'তবু, এর মধ্যে কাউকে কী তোমার চোখে পড়ে নি।'

'নাহ্'।

'কেন অরূপ ?'

ও নামটা কানে যেতেই কেমন হতভম্ব হয়ে যাই। আমতা আমতা করে বলি, 'হঠাৎ অরূপের কথা তোমার মনে পড়লো কেন বলতে পার ?'

চারু বলে, 'যদি অভয় দাও তো বলি। আর তোমার সাহায্য ছাড়া আমি কিছুই করতে পারবো না।'

আমাকে চারু এত শক্তিমান মনে করছে কী করে ? তাহলে এতদিন ও যা মুখে বলতো তার সবটাই ঠিক নয়। আবার বিরাট এক অন্ধকার খাদে পড়ে যাই আমি। ফলে আমি বড় বেশি অসহায় বোধ করি। কিন্তু কিছু একটা উত্তর তো চারুকে দিতেই হবে ? মুখে এসে গেল, 'তুমি আমার পাশে থাকলে কোন কিছুকেই আমি পরোয়া করি না।'

চারু গম্ভীর গলা করে বলল, 'এ বাড়ির আভিজাত্য নিয়ে সত্যি কী তুমি অহংকার বোধ কর ?'

মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়, 'মোটেই না। একদম ভূষিমালে ভরা। জুয়াড়ী, মাতাল আর…… ।'

'আর কী ?'

সে কথা তোমার সামনে প্রকাশ করতে লজ্জা হয়। কুইন আর লাণ্টুর কী সম্পর্ক, অথচ কী গোলমেলে সব ব্যাপার। বিজন সুমি ঝিটাকে নিয়ে বেলেল্লাপনা করছে, তোমাদেরও কোন মান সম্মান নেই, মেয়ে ছেলে হলেই হ'ল। এদিকে বাইরে ফুটুনি। পুজোর সময় চুনোট করা ধুতি পাঞ্জাবি পরে ছেলেরা সেণ্ট পাউডার

মেখে মা দুগ্‌গোর বিসর্জনে বেরোয়, মেয়েরাও কম বেহায়া নয়, সকাল থেকে খেস্তাখেস্তি। সত্যি বলছি চারু, এসব একদম আমি সইতে পারি না। এ বংশে না জন্মে অন্য কোন বংশে জন্মালেও অনেক সম্মান থাকতো। আজ দিলীপটাকে পাড়ার মুদি রাধেশ্যাম কী যাচ্ছে তাই কথা শোনাল। খালি ফোর টোয়েন্টি গিরি করবে, মুখে লবচবানি, মান ইজ্জত ওদের জন্য আর রাখা যাবে না। সুষ্মু বলছিল, 'ক'মাস দেওঘরে কাটিয়ে আসার কথা। ও নাকি আমাদের খুব বিপদ দেখতে পাচ্ছে। মৃদুলকে নিয়ে ঘণ্টু, বিজন, পলাশরা কী সব জোট পাকাচ্ছে। যাই বল, সুষ্যুকে যতটা নির্বোধ ভাবি, তা কিন্তু নয়। ওর কথা শোনার পর থেকেই কেমন ভয় সেঁধিয়ে গেছে আমার মধ্যে। চারুর হাত দুটো ধরে খুব করুণ গলা করে বলি, 'আমাদের না মিঠু আর সুষ্যুকে বাঁচাতেই হবে। বংশ দিয়ে ধুয়ে খাব নাকি? তুমি রাজী হলে, এ বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে ভাড়া বাড়িতে বাস করবো। সব সময় আমার দম বন্ধ হয়ে যায়।'

চারু দৃঢ় ভঙ্গিতে বলে, 'তাহলে, আমি যা করবো তাতে বাধা দিও না। এ বাড়িতে এত পাপ যে ধুলেও যাবে না। আগুনের প্রয়োজন হবে। মিঠু আর অরূপ হবে সেই আগুন। ওদের দৌরাত্ম্য তো অনেক দেখলে? একে পুরোপুরি উৎখাত না করা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। মৃদুলের জন্য আমার ভাবনার শেষ নেই। অমন সুন্দর একটা ছেলে, যে আমাদের সকলের গর্বের, তাকে নিয়ে কী নোংরামি হচ্ছে। এরা ভাল কিছুকে সহ্য করতে পারে না, সর্বনাশ করার ওস্তাদ। মিঠু অরূপের সম্পর্কটা মা হয়ে আমার নজর এড়ায় নি। জোর করে মিঠুর বাদ কিছু করতে যাই তো পরিণাম সুখের হবে বলে মনে হয় না।' আমি চারুর যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারি না। আবার এ-ও ভাবি, এ বাড়ির লোক মিথ্যে আভিজাত্যের ধ্বংসস্তূপকে আঁকড়ে ধরে আছে। চারুই একদিন বলেছিল, 'নতুন কিছু করতে গেলে একজনকে তো এগিয়ে আসতেই হবে, তাতে হয়তো সাময়িক একজনের ক্ষতি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-ই জয়ী হয়। কথাটা মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল। বললাম, 'এ নিয়ে মৃদুলের সঙ্গে কী তোমার কোন কথা হয়েছে?'

'নাহ্‌। সেটা সেরে নেবো দু'একদিনের মধ্যে। ও তুমি ভেব না।'

আলো আঁধারীতে চারুকে খুব সুন্দর দেখায়। ওর মনের গুমোট ভাবটাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বলি, 'মিঠুর সুখই তো আমাদের সুখ, তাই

না চারু ?'

চারু আমাকে আলিঙ্গনাপাশে আবদ্ধ করে। আমি সুখের অতল গহ্বরে ক্রমশ তলিয়ে যাই।

সূর্যকান্তর কথা

আমাকে দেখলেই ওরা সকলে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আমি এ সব বুঝি, তা ওদের বুঝতে দিই না। 'তেঁয়েটে' শব্দটা আমার ক্ষেত্রে খুব ভাল ভাবেই খাটে। ডুবে ডুবে জল খাওয়ার ব্যাপারটা আমি এ বাড়ির পরিবেশ থেকেই রপ্ত করেছি। ওরা আমার বাবা-মাকে নিয়ে যা তা বলে, এটা ক্রমশই আমার সহ্যের বাইরে চলে যায়। বাবা যাই হোক, মা'র মত মানুষ আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা জানি না। সে জন্য মুখে প্রকাশ না করলেও, মা'র প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে। আমার দাদামশাইয়ের অর্থ কৌলিন্য না থাকতে পারে, কিন্তু বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আর মানুষ হিসেবে যে খুব বড় মাপের এটা জানতাম। শকুনি যেমন বন্ধু সেজে কুরু বংশের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল, আমিও নিজেকে শকুনি ভাবতে শুরু করলাম। ওদের সকলকে আমি উলঙ্গ করে ছাড়বো এটা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি।

বিজনদাকে একদিন বললাম, 'তুমি মাইরি এখন কেমন পাল্টে গেছ। ভাল-মন্দ কতদিন হচ্ছে না বলো তো? জীবনটা তো পানসে হয়ে গেল বিজনদা।'

কুইন ফিরে আসার পর থেকেই লাল্টুর এ আসরে ঘনঘন যাতায়াত শুরু হ'ল।

ঘণ্টু তো হ্যা হ্যা করে হেসেই বাঁচে না। ও ফিচেল হেসে আমাকে লক্ষ করে বলল, 'সূয্যি এ বংশের মান ইজ্জত বজায় রাখতে পারবে বিজন। ওকে দু'ঢোক গিলিয়ে দাও, দেখো কেমন চাঙ্গা হয়ে যাবে কস্ করে।'

লাল্টু এমনি বলে, 'যা বলেছ ঘণ্টুকাকা, সূয্যিদাটা এক নম্বরের গাঁড়ল। বোনটা সারা সময় ওই ছোকরাটার সঙ্গে 'ইয়ে' করছে, আর ও এখানে এসে খসখসে ঠোঁট চাটছে।'

মাথাটা হঠাৎই ভীষণ ভারী হয়ে যায়। তবু জানি, চটে গেলে কাজ হাসিল হবে না। কী মনে করে বলি, 'এতকাল তোমাদের পয়সায় খেয়েছি। গতকাল ভাল কামাই হয়েছে, আজ আমি তোমাদের খাওয়াব।'

মুহূর্তেই ঘরের চেহারা যায় পাল্টে। সত্যি গতকাল উটির রেখে আমার পকেটে অনেক টাকা। মাত্র চারটাকায় দুশো তিপ্পান্ন টাকা বাচ্চু বুকির কাছ থেকে আমদানী করেছি। ওরা সকলেই আমাকে অভিনন্দন জানায়। আমি মনে মনে হাসি।

ঘণ্টু কাকা সহাস্যে বলে, 'গুরুদক্ষিণা দে সুয্যি কেমন লাইন চিনিয়েছি বল?'

কাজ হাসিল করতে গেলে অনেক সময় অনেক নিচু কাজও করতে হয়। সেটা এই হারামী ঘণ্টুর কাছ থেকেই জেনেছি। দক্ষিণের ঘরে ওই আমাকে ঢুকিয়েছিল, ফাইফরমাস খাটিয়েছে বটে, টুকটাক মাল সরিয়েছি সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, আজ সেই আমিই লাল্টুর দিকে শ' খানেক টাকা এগিয়ে দিয়ে বলি, 'এক্ষুনি মানিকতলায় চলে যা লাল্টু। ব্লাক নাইট নয় তো ওল্ড ট্যাভার্ণের পাঁইট নিয়ে আয়। ফেরার পথে ভজুয়ার দোকান থেকে সোডা কিংবা লেমনেড নিয়ে আসবি আর গাঙ্গুরামের চানাচুর। যা দেরি করিস নে। ঠোঁটগুলো সব শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেছে '

বিজনদা খুশি খুশি গলা করে বলে, 'সোনার টুকরো ছেলে হয়েছে সুয্যি। কি ট্রেনিং দিয়েছ মাইরি ঘণ্টু কাকা।'

ঘণ্টু কাকা বলে, 'তা ঠিক। মালটি সরেস। সময় নষ্ট না করে আর্নিং-এর পথে নেমে গেলেই হয়।'

যেমন কথা তেমনি কাজ। জনা ছয়েকের একটা ছোট্ট আসর মুহূর্তেই বিছোন ফরাসের ওপর ঠিক ঠিক জায়গা নিয়ে বসে পড়ে। প্রথম কয়েক দান ওদের বুঝতেই দিলাম না আমার আসল মতবলটা কি! আনসিন খেললাম। টাকা দশেক গচ্ছা গেল। এবার একটু সতর্ক হয়ে সিন আনসিন মিশিয়ে এমন খেলা শুরু করলাম যে ওরা মনে মনে আমার ওপরে ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেল। লসের টাকা তো উঠে এলোই, চার পাঁচটা দানের মধ্যেই পকেটে গোটা তিরিশেক টাকা কামাই করে ফেললাম। এবং এরই ফাঁকে হিসেব কষে নিলাম, যদি শ'খানেকও মালের পেছনে যায়, তো এর তিরিশ মেকআপ হয়ে গেছে।

একটু পরেই ঘেমো মুখে লাল্টু এসে হাজির। সকলেই ভীষণ পিপাসার্ত হয়ে পড়েছিল। লাল্টু মেপে মেপে গেলাসে মদ ঢেলে সোডা মেশাতে লাগল। বিজনদা রক্তচক্ষু করে বলল, 'নো সোডা। আজ 'র' ছাড়া চলবে না। ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। যে যত পারিস গিলে যা। হারামের পয়সা পেটে গিয়ে যখন কোত্‌কা মারবে তখন চোখে মিস অমুক, মিস তমুকের নাচ দেখবি।' এরই

ফাঁকে ফাঁকে খেলা চলতে থাকল।

কী মনে করে আমি মৃদুলদার কথা তুলে বললাম, 'মৃদুলটাই এ বাড়িতে সন্ন্যেসী হয়ে রইল। এটা আমাদের ডিফেক্ট। অনেক মাল ওর বাপ-ঠাকুর্দার দৌলতে। শালা সেয়ানার বাদশা। পয়সা চিনেছি খুব' মুখে খালি লম্বা চওড়া বাত।

এরই মাঝে লাল্টু আরও দুবার গেলাস ভর্তি করে দিয়েছে। আমাকে দিতে এলে বলেছি 'তোরা হচ্ছিস আমার গেস্ট। তোরা সন্তুষ্ট হলেই আমার সুখ। নে নে তুইও দু চুমুক মেরে দে। সাবধান কুইনের কাছে মার খেয়ে যাস না।

সকলেই সে কথায় হেসে ফেলে। লাল্টুর সে সবে নজর নেই। ও গেলাসে চুমুক বসাতে বসাতে একটা হিন্দি গান গেয়ে ওঠে মুঝে দুনিয়াওয়ালো সরাবি না সমঝো ম্যায় পেতা নেহি হুঁ পিলায়ি গেয়ি হ্যায়।'

সকলেই বলে, 'জিও বেটা, জিও।'

শুধু বিজনদা বলে, 'ও শালা মৃদুলের নাম আমার কাছে আর কখনো করিস নি। ওর দিন ফুরিয়ে এয়েছে বুঝলি? ভাবছি, ওকে ল্যাংড়া করে রেখে দোব। শালা বাইরের ওই রদ্দি ছোঁড়া অরুণ না কে ওর সঙ্গে মঠুকে লড়িয়ে দিয়েছে। এ বংশের মর্যাদা বলে কী কিছু নেই? শোন সুয্যি, অরুণ এলে ঢুকতে দিব না। ও তোদের মুখে চুনকালি মাখাবে দেখিস। আমরা পেডিগ্রি দেখে ঘরে জামাই আনি বুঝলি।'

ঘণ্টু খ্যাক-খ্যাক করে হাসে। ওর হাসি দেখে আমার গা ঘিন ঘিন করতে থাকে। অমন কুচ্ছিৎ ভঙ্গি যে মানুষ করতে পারে, তা ওকে না দেখলে ভাবতেই পারতাম না।

আরও তিনটে বড দান মেরে দিলাম আমি। খুচরো পয়সা টাকা কোলের কাছে টানতে যাব ঠিক সে সময় বিজনদা বলে, 'তুই আজ জোচ্চুরি কচ্ছিস সুয্যি। পরপর দু-দান রানিং ফ্লাস আর ট্রায়ো মারা যা-তা ব্যাপার নয়। মাল গিলেছি বলে কী গাঁড়ল হয়ে গেছি। কিছুই টের পাই না নাকি?'

আমি থতমত খেয়ে বিজনদার মুখের দিকে চেয়ে ঘণ্টুর সমর্থনের জন্য চেয়ে থাকি। ঘণ্টুও কিন্তু আমাকে সমর্থন করলো না, বলল, 'বিজন ঠিকই বলেছে, আলবাৎ কিছু গড়বড় কচ্ছিস তুই তাসের।'

আমি নিজেকে সতর্ক করে ফেলি মুহূর্তে। ক্ষেপে গিয়ে আমিও বুদ্ধি ভাবা

ব্যবহার করতে পারতাম, কিন্তু শকুনির কথা মনে পড়তেই আমি আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গি করে বলি, 'ব্যস, এ দানের টাকা আমি নোব না। এটা আমাদের মাল্লু ফাণ্ডে জমা থাকবে। বিজনদা তুমিই গোন, কত আছে। মালতো ফুরিয়ে গেল, লান্টুকে ফের মানিকতলায় পাঠিয়ে দাও।'

চালটা মোক্ষম চেলেছি। ওরা সকলেই আমাকে ভীষণ তারিফ করছিল।

প্রশংসার ঘোর থাকতে থাকতেই আমি ইচ্ছাকৃত ভাবে বললাম, 'তাস সাফল্‌ও করবো না, বিলোবোও না। আমার টার্ন এলে তোমরাই কেউ বেটে দিও।' এ কথা বলেছি, এ কারণেই যে, তাসের লাক এক একদিন এক একজনের ভাগ্যে চেপে বসে। আমি জোচ্চুরি করি নি, তবু ওরা আমাকে জোচ্চর বলল, লাক যে রকম ফেভার করছে, তাতে আজ আমি ওদের হাড়ে দুব্বোঘাস গজিয়ে ছাড়বো। ওরা যত রেগে যাবে, ততই আমার লাভ! কেন না, পেটে মদ আর মাথায় রাগ, এ দুটো যদি ঠিকঠাক মতন কাজ করে তো, ও দু-চারটে কথা বেফাঁস বলবেই বলবে।

পরপর দুটো দানই আমি সামান্য সময় আনসিন থেকে সিন করেই তাস প্যাকে ফেলে দিলাম। ওরা এতে আরও বেশি উৎসাহী হয়ে পড়ল।

বেশ নাটুকে ভঙ্গিতে লান্টুকে বলি, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছিস যে? দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেলে সেই গড়ানহাটার পানের দোকানে ছুটতে হবে।' বলেই গেলাসটা এগিয়ে দিলাম ওর দিকে।

লান্টু আগের বোতলের তলানিটুকু আমার গেলাসে ঢেলে টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সাতটা বেজে গেছে। এরই মধ্যে জেঠা, কাকা শ্রেণীর কয়েকজন আমাদের তাসের আসরে গুটিগুটি ঢুকে পড়ল।

এখানে আমরা সবাই একই শ্রেণীর যাত্রী। সম্মান-টম্মান সব শিঁকেয় তুলে দিয়ে ঘণ্টু ফিচেল হেসে বলে, 'এত দেরি করলে কেন সব। আজ স্মৃম্যাটা সবাইকে ফরসা করে দিচ্ছে।'

প্রিয়নাথ জেঠা সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ আমি একটু টাইট পজিশানে আছি, যদি দরকার হয় তো তোর কাছ থেকে লোন নোব।'

আমিও সেয়ানা কম নই। বিজনদার দিকে চোখ রেখে বলি, পরশুদিনই তো সব ঠিক হ'ল, বোর্ডে ধার বাকি চলবে না। আইন পাল্টালেই আমি দিতে পারি। তোমার কাছে থাকাও যা, আমার কাছে থাকাও তাই, তবে জানই তো, এটা লাকের খেলা, আমার লাক তোমাকে ধার দিয়ে নিজে ফতুর হব, এটা

মন পছন্দ নয়।'

বিজনদা বলে, 'দিনদিন সুয্যুর ব্রেন খোলসা হচ্ছে।'

'গণার ছেলে হয়ে ও কী বংশের নাম রাখবে না বলতে চাস। গণাটা হাড় কেপ্পন, ওর কাছ থেকে উপুর করা কঠিন'। প্রিয়নাথ জেঠার কথায় সকলেই হো-হো করে হাসে।

ছাগলছানার মত এদিক-ওদিক করল লাণ্টু। বিজনদা দেই দেই করেও যে কথাটা বাবার নামে প্রয়োগ করলো ও নিজে সেটা করছে দেখে অর্থাৎ হাত উপুর করছে না দেখে আমি একটু শ্লেষ মাখান সুরে বললাম, 'শুধু বাবাকে দুষছো কেন, এ ব্যাপারে এ বাড়ির অনেকেই বেশ সেয়ানা। চোখে ঠুলি পড়ে থাকলে ও সব কিচ্ছু নজরে পড়ে না।'

লুজারদের মধ্যে শ্যামল, সুহাস, ঘণ্টুও ছিল। কী মনে করে সুহাসই বলল, 'সুয্যু কথাটা ঠিকই বলেছে। লাণ্টু কখন থেকে বিজনদার পাশে ঘুর ঘুর করছে অথচ যে টাকা বোর্ডের তা উপুর করার নামও করছে না। বিজনদা টাকাটা দিয়ে দাও না বাবা, ল্যাঠা চুকে থাক। ঝাড় তুমি একাই খাওনি, আমরাও খেয়েছি, লাণ্টুটা চটপট মাল আনতে চলে যাক, গলাবুক আমাদেরও শুকিয়ে যাচ্ছে, দু' ঢোক না খেয়ে আর পারছি না।'

বিজন হারামী এবার জোর প্যাঁচে পড়ে গিয়ে আমারই পাওনা টাকা দাতা কর্ণের মত লাণ্টুর হাতে তুলে দিতে দিতে বলে, 'যাবি আর আসবি, বুঝলি।' লাণ্টু টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

খেলা জমে উঠল ফের। পরপর বেশ বড় দুটো বোর্ড পেয়ে গেলাম আমি। মনে মনে বললাম, গণা মুখুজ্জে। তোমার ছেলে বলে সকলেই বড় হ্যাটা করে, কিচ্ছু চাই না ফাদার, একটু আশীর্ব্বাদ করো. শালাদের মুখে আজ যদি আমি পেচ্ছাব না করিতো. কী বলেছি। এই সব ভাবনার ফাঁকেই আমি হিসেব কষে দেখি, ইনভেস্ট মানি অনেক আগেই আমি পকেটস্থ করেছি। এবার যদি যায়ও তো বিজন হারামীর কথা মত লভ্যাংশে লস হবে। মনে মনে খুশি হলেও মুখখানা হুমদো মুখো করে রাখি, যাতে কেউ ধরতে না পারে যে, আমার মনে খুশির ঝড় বইছে। এছাড়া বার বার উঠে গিয়ে জগের জল ঘন ঘন শেষ করতে থাকি।

ঘণ্টু বলে, 'টাকার গরমে সুয্যুটার দেখছি বেহাল অবস্থা। কোনদিন যদি সোনার চাঁদ জ্যাকপট পায় তো লাট্টুর মত বন্‌বন্‌ করে পাক খাবে দেখিস।

এবার কেউই তেমন হাসল না।

হঠাৎ বিজন বলল, 'বুঝলি সুয্যু, তাস তোকেই সাফ্‌ল্‌ করতে হবে, ডিস্ট্রিবিউটও করতে হবে। আমাদের লাক তুই বেশ ভাল মানুষ সেজে কেঁচিয়ে দিচ্ছিস।'

আমি সকলের দিকে চেয়ে বলি, 'অথচ একটু আগে তোমরা সকলেই আমাকে জোচ্চর বলেছ। আমি বললে বাপ-বাপান্ত করতে, তাই অতগুলো-টাকা কথা না বাড়িয়ে বোর্ডে জমা দিয়েছি। এখন সে টাকাতেই লাল্টু মাল আনতে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছি না তোমাদের সব মতলবটা কী? যেদিন তুমি টানা জিতে যাও, সেদিন কেউই কোন কথা বলে না। আমার বেলা হলেই দেখছি, সবাই নতুন আইন জারি কর, তার চেয়ে আমি বরং অফ হয়ে যাচ্ছি, তোমরা প্রাণের আনন্দে খেল। লাল্টু মাল নিয়ে আসুক, আমি শুধু দু'ঢোক খেয়ে চলে যাব।'

এতো হয়না চাঁদ। তোর পকেটের সব টাকা না হাত করা পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি নেই।

আমি জানি একথায় অনেকেই আপত্তি তুলবে। কেননা, জুয়ার আসরে এ ধরনের কথা বলা মানে বোর্ডের অপমান।'

প্রিয়নাথ জেঠা বলেন, 'কি বলছিস বিজন? তিন তাসের আসরে ওসব বলা চলে না। তোদের থেকে প্রায় বিশ বছরের বড় আমি, অনেক পাটোয়ার খেলুড়ে দেখেছি। এমন কথা এর আগে কখনও শুনি নি। সুয্যু আজ জিতছে, কাল হয়তো অন্য কেউ জিতবে, এইতো এ আসরের মজা। আর যার খুশি, সে অফ হয়ে যেতে পারে। সুয্যু কথাটা কোন ভুল বলে নি। ওকে সন্দেহই যখন করেছিস, তো ওর এভরি রাইট আছে, খেলা ছেড়ে দেওয়ার।'

আমি প্রিয়নাথ জেঠাকে জব্বর একটা পেন্নাম ঠুকে গাঁট হয়ে বসে থাকি।

প্রিয়নাথ জেঠা আমার চোখে চোখ রেখে বলেন, 'ক'দান অফ হয়ে যা সুয্যু, দেখি বিজনের দিকে হাওয়া ঘোরে কিনা?'

সেকথায় সকলেই হেসে উঠলেও বাইরের কি একটা হৈ-হট্টগোলের শব্দে কেমন যেন সকলেই ঘাবড়ে যায়।

বিজন বলে 'যা তো সুয্যু দেখে আয় তো ব্যাপারটা কী?'

আমিও স্পষ্ট জবাব দি, 'পয়া জায়গা আমি ছাড়ছি না, দেখতে হয় তুমি দেখে এসো। এ বাড়ি অনেকদিন ঝিম মেরে বসে আছে, তবেই না বুঝবে

মুখুজ্জেরা বেঁচে আছে।'

এসব কথা বললেও আমার নিজের প্রতি নিজেরই কেমন অবিশ্বাস জন্মায়। এত জোর গলায় তো এর আগে আমি কথা বলতে পারতাম না। বিজনই পাঠাল শ্যামলকে খোঁজ পাত্তা করতে।

শ্যামল হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে যা বলল, তাতে আমরা সবাই তাজ্জব। মানিকতলায় না গিয়ে লাণ্টু নাকি ফের কুইনকে নিয়ে ফস্টিনস্টি করছিল। কুইনটার যে কী হয়েছে কে জানে! দেওঘর থেকে ফিরে এসে ও যেন বম্বের নায়িকা হয়ে গেছে। শরীরে ঢেউ খেলিয়ে এ বাড়ির ছেলে-ছোকরাদের পাগলা করে দিচ্ছে।

বিজন ভারী গলা করে বলল, 'কার সঙ্গে হচ্ছে?'

'আবার কে? গ্রেট মৃদুল মুখুজ্জের সঙ্গে।'

'শুয়োরের বাচ্চার বড় বাড় বেড়েছে, ওকে একটু শিক্ষা না দিলে চলছে না।' বলেই বিজন সিঙারা মার্কা চুল নিয়ে ওস্তাদী কায়দায় দক্ষিণের ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওর পেছু পেছু ঘণ্টুও। আমি চুপচাপ বসেই থাকি। মিনিট দশেক পর চিৎকার আর মুখখিস্তির পর্দা যখন চড়তে থাকে সে সময় আমি পাকা জুয়াড়ীর মত টাকা পওসা সামলে বাইরে বেরোই। এসেই যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাতে সর্ষে ফুল দেখার দশা। লাণ্টু কাটা পাঁঠার মত কাঁপছে। বিজন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মৃদুলদার এক ধমকানীতে চুপ হয়ে গেল।

মৃদুলদা রাগী গলায় বলল, 'এ বাড়িতে অনেক কেচ্ছা আছে, যা আগে কক্ষনো হয় নি, তাই কী হবে নাকি? খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাইবোনের এই কী সম্পর্ক। বেশি কেউ গলা চড়িয়ে এর বিরুদ্ধে একটা কথাও যে বলবে, তার জিব টেনে আমি বার করবো।'

বিজন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, 'খুব যে মস্তানী ঢং-এ কথা বলতে শিখেছিস মৃদুল। মনে রাখিস, এ বাড়িতে তোকে আমরা দয়া করে রেখেছি।'

মৃদুলদা সে কথায় এমন ভাবে হাসল যে কী বলবো। ও হাসতে হাসতেই বলল, 'পশুপতি মুখুজ্জের কথা কি সব ভুলে গেলে? মনে রেখো, এ বাড়ির এখনও পঁয়ষট্টিভাগ লোকই পশুপতি মুখুজ্জের দয়ার অন্ন খাচ্ছ। এখনও ওসব কম্পানীতে আমার খাতির আছে। চেষ্টা করলে, আমিও ছেড়ে কথা বলবো না।'

ঠিক সেই সময় ঘণ্টুকে ফিসফিস করে বলে বিজন, 'অনেক হয়েছে। তুমি আজই গড়পাড়ের ভূষণ আর চীনাকে খবর দাও গে যাও। শালাকে মুলো

করে রেখে দোব চিরজন্মের মত।'

বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় আমার। ভূষণ আর চীনা যে কী সাংঘাতিক তা বেশ ভাল করেই জানি। চোরা গোপ্তা মারে ওদের তুলনা নেই। ওরা দুজনই ভাড়াটে গুণ্ডা। টাকা ছড়ালে ওদের দিয়ে দুঃসাধ্য কাজও করা যায়। পার্টির দাদাদের মদত আছে ওদের পেছনে বলে কেউ কেউ। পুলিশ ওদের নাড়ীনক্ষত্র জানে, তবু ওরা বুক ফুলিয়ে দিন দুপুরে ঘুরে বেড়ায়। মোটর সাইকেল চালিয়ে পাড়ায় শব্দের ঝড় তুলে ওরা সকলকে জানান দেয়, ওরা আছে, ওরা থাকবে। ওদের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস কারো নেই। আমি এ সবই জেনেছি ঘণ্টু কাকার কাছ থেকে।

আজকের এই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ভূষণ আর চীনাকে মুখুজ্জে বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে দেখেছি। বিজনদা আর ঘণ্টুকাকা কেন যে ওদের নিয়ে এত মাখামাখি করছে, বুঝতে পারি না।

বিজনদা ঘণ্টুকে ও কথা বলতেই সুরুৎ করে জটলার ভেতর থেকে ঘণ্টুকাকা সরে পড়ে। এটা আমার নজর এড়ায় না। এখন আমার কি কর্তব্য, তা কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। ভিড়ের ভেতর থেকে মৃদুলদাকে যে কিছু বলব, তা সম্ভব নয়, আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে।

পুলিন কাকার কথা মনে পড়ল প্রথমে। কিন্তু এ বাড়ির কাউকেই কী তেমন বিশ্বাস করা চলে? না বিশ্বাস করা যায়? এটা মুহূর্তের মধ্যে ভেবে আমি যা কোনদিন করিনি তাই করে বসলাম। জানি ভুরভুর করে মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, পকেটে আমার শ' চারেক টাকা। এ সব নিয়ে আমি এই প্রথম মিঠুর কাছে আসি।

মিঠু আমাকে দেখেই ঘেন্নায় নাক কুঁচকোয়।

আমি বলি, 'মিঠু আজকের দিনের জন্য ওসব ঘেন্না করিস নি। আজ আমি যা বলব, সবই বিশ্বাস করবি। আমি অপদার্থ, ছোটলোক, বজ্জাত হতে পারি কিন্তু মা কালীর দিব্যি দিয়ে বলছি মিঠু, ওদের থেকে আমি হাজার গুণে ভাল। বিশ্বাস কর, মৃদুলদার খুব বিপদ। বিজনদা আর ঘণ্টুকাকা ওর বিরুদ্ধে কিছু একটা সর্বনাশা ষড়যন্ত্র করছে। ভূষণ আর চীনাকে খবর দিতে গেছে ঘণ্টুটা। ওরা যা বলে, সব তোকে বলা যায় না। এ সব ঘুণাক্ষরেও অন্য কাউকে বলিস না। মা'র সামনে দাঁড়াবার সাহস আমার নেই। মা'র মত মানুষ হয় না, আমাকে এ অবস্থায় দেখলে, কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। মাকে

আমি খুব শ্রদ্ধা করি, ভয়ও পাই। তুই এবার যা করার কর। আমি বেশিক্ষণ গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারব না. তাহ'লেই ওরা আমাকে সন্দেহ করবে। আমার ভয় আর একটা ব্যাপারে। সেটা অরূপকে নিয়ে। ওরা ওকে আর তোকে নিয়ে যাচ্ছেতাই কথাবার্তা বলে। মৃদুলদার কোন ক্ষতি করতে না পারলে ওরা সম্ভবত অরূপেরই কোন ক্ষতি করে বসবে। ওর মতন একজন সৎ, বিবেকবান ছেলের কোন ক্ষতি হোক, আমি চাই না। তুই বোধ হয় ভাবছিস, নেশার ঘোরে আমি ভুল বকছি। কিন্তু তা নয়রে মিঠু। আমি ওদের সর্বনাশ করবো ঠিক করেছি। কাঁহাতক বাপ-মায়ের অপমান. বোনের অপমান সহ্য করতে পারি বল ?'

মিঠু অবাক চোখে আমাকে দেখছিল। এ সে কি শুনছে ? আমার মনে হ'ল ও বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দুলছে। এখন মিঠুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওসব শুনে।

আমি বললাম, 'এখন সব দায়িত্ব তোর। এ বংশের ব্ল-ব্লাড না কী বলে, তাকে খতম করার দায়িত্ব-এখন আমাদেরই নিতে হবে। একা মৃদুলদার পক্ষে সব করা সম্ভব নয়। সুযোগ বুঝে মৃদুলদাকে এসব জানাতে ভুলবি না আমি চললাম।'

মিঠু কোন কথা বলল না। আমি যতক্ষণ কথা বলছিলাম ও আমার আপাদ মস্তক দেখছিল। জানি, হঠাৎ কেউ যদি এরকম কোন সংবাদ শোনে তাহলে, তার অবাক হবারই কথা।

দক্ষিণের ঘরে তখনও একদল নির্বিকার জুয়ায় মত্ত। লাল্টু এরই মাঝে ফিরে এসেছে। ও আমাকে দেখেই বলল, 'কোথায় ছিলে ? শালার মেজাজটা ও শুয়োরটা বরবাদ করে দিলে। লাল্টুর মত ছেলেকে ভুলোতে কতক্ষণ লাগে।

বললাম 'ও সব খেউর কেত্তনে আমি নেইরে লাল্টু। পেট্রোলপাম্পের কাছে গিয়ে দু গেলাস সিদ্ধির সরবৎ চড়িয়ে মেজাজ শাফ করে এসেছি। তোরা কে কী করছিস ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। যদি চাস তো বল, তোকেও দু'গেলাস সরবৎ গিলিয়ে দি। ভারী টেস্ট। গন্ধ কন্দর বালাই নেই, অথচ মেজাজটা এমন শরিফ হয়ে যায় যে কী বলবো।'

লোভী লাল্টুর চোখ চকচক করে ওঠে সে কথায়। বলে, 'সুযুদা চলো না মাইরি তা হ'লে।'

'চল।' এই প্রথম আমি লাল্টুকে চাকরের চেহারায় দেখতে পাই।

-সকলেই আমাকে এতদিন চাকরের চাকর বলে হাসি ঠাট্টা করেছে, এবার বদ্‌লা নেওয়ার দিন বোধহয় ঘনিয়ে এল।

দোকানের মালিককে ইশারায় বেশ কড়া করে সিদ্ধি দিতে বলে, খোস মেজাজে সিগ্রেট ধরাই। লাণ্টুর দিকে একটা সিগ্রেট এগিয়ে দিয়ে বলি, 'নে, এটা ফুঁকে দে।'

লাণ্টু হাত বাড়িয়ে সিগারেট নেয়।

ঘন সরবৎ লাণ্টুর হাতে এগিয়ে দেয় দোকানদার। লাণ্টু বেশ স্বাদু সিদ্ধির গেলাসটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে খায় না, এক চুমুকেই শেষ করে।

বলি, 'মাল ভাল না সিদ্ধি ভাল বল? এক গেলাসে তেমন মৌতাতও হয় না। ওর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই দোকানদারকে আর এক গেলাসের অর্ডার দিই। সেই গেলাসটাও লাণ্টু উজবকের মত এক চুমুকেই শেষ করে সিগ্রেট ধরায়। বলে, 'বেশ লাগছে, মাইরি সুয্যদা।'

বেশ চালিয়াতি ঢং-এ উত্তর দি, 'ভাল লাগার জন্যই তো এ-সব। মেয়ে মানুষেও এত সুখ নেই। মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি মারবি তো বাইরে করবি, বাড়ির ভেতরে করলেই লোকে কথা চালাচালি করবে। বিজনদাটা না এক নম্বরের সেয়ানা। সুমি ঝিটাকে নিয়ে কত লটর পটর করে, সবাই জানে, কেউ কিচ্ছু বলে না। সুমি তো আর মুখুজ্জে বাড়ির কেউ নয়, ওর পেটে বাচ্চা এসে গেলেও কিছু যাবে আসবে না। এর-ওর নামে দোষ চাপিয়ে সুমিকে একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। মুখুজ্জেরা এতে ওস্তাদ। মেয়েটার শেষ পর্যন্ত সোনাগাছির বেশ্যা হওয়া ছাড়া পথই থাকবে না।'

লাণ্টু আমার সব কথা শুনলো কি না শুনলো তা আমার বয়ে গেল। আমি সুযোগ বুঝে জিজ্ঞেস করি, 'ভূষণ আর চানাকে নিয়ে, কা এত ফুস্‌র ফুস্‌র হয়রে লাণ্টু?'

লাণ্টু ভোঁদা মুখে বলে, 'মাইরি বলছি সুয্যদা, ওদের দেখলে আমার বুক কাঁপে। খুনে দুটোকে নিয়ে ওদের অত মাতামাতি করা আমার ভাল লাগে না। কুইন আমায় ছাড়বে না। ও আমাকে নিয়ে পালাতে চায়। কী করি বলো?'

আমি ভাল মানুষের মত মুখ করে বলি 'ফাঁসালি ফাঁসালি কুইনকে ফাঁসালি। -সম্পর্কের কথা একবারও মাথায় এল না?'

লাণ্টু অমনি বলল, 'সম্পর্কের কথাই যদি বলো তো, একটা কথা বলবো

কিছু মনে ক'রো না। তোমাকে এ্যাদ্দিন বলিনি। ঘণ্টুকাকা একদিন মিঠুকে জড়িয়ে চুমু খেয়েছিল, আমি দেখেছি। ও মিঠুকে দেখলেই চোখ মারে, চিঠি লেখে, আরও কত কী করার চেষ্টা করে। তুমি রেগে যেও না মৃদুদা। মিঠুর কাছে ও হারামী এমন চাট খাবে যে কী বলবো।' বলেই হি হি করে হাসে। এ হাসি অনেকক্ষণ ধরে চলবে। সিদ্ধির প্রভাব শুরু হয়েছে ভেবে বলি, 'বেশি কথা বলিসনে। এখন খালি গুম মেরে বসে থাকার সময়। 'চ' বাড়ি যাই।'

এবার বাড়ি এসে যা দেখি, তা দেখে ভয়ে কেন্নোর মত গুটিয়ে যাওয়ার দশা হয় আমার। খবর পেয়ে ইতিমধ্যে ভূষণ আর চীনা এসে হাজির হয়েছে। ওদের দেখে মৃদুলের মেজাজও গেছে সপ্তমে চড়ে।

মৃদুল চেঁচাচ্ছিল বাড়ির সকলকে উদ্দেশ্য করে, 'তোদের সকলের জন্য শাড়ি সায়া কিনে দেবো; এবার থেকে তাই পরে থাকবি। নিজেদের মুরোদ নেই, মস্তান ডেকে এনেছে বাড়িতে। ঘেন্না করে না তোদের। থুতু ফেলে ডুবে মর। বাড়ির কেচ্ছা পাড়াময় ছড়াতেই যদি চাস তো বলনা বুক ফুলিয়ে, আমিই সেই দায়িত্বটা নোব।'

ভূষণ এগিয়ে এল মৃদুলের দিকে, 'মুখ সামলে কথা বলবে বলে দিলুম। আমরা মস্তান তো তোর বাপের কি রে?'

মৃদুলদার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। ভূষণের জামার কলার চেপে ধরে বজ্রগম্ভীর গলায় বলল, 'দুমিনিটের মধ্যে যদি বাড়ির চৌকাঠ না পেরোস তো, তোদের বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব।'

ভূষণ এক ঝটকায় মৃদুলের হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'থোবড়া ভেঙে দোব রে। জন্মের মত টের পাবি ভূষণ আর চীনা কি চীজ।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই মৃদুল প্রচণ্ড জোরে ভূষণের মুখে ঘুষি চালিয়ে বলল, 'কে কার বাপের নাম ঘোঁচায় আয়।'

চীনা যখন একটা ধারাল ছুরি নিয়ে মৃদুলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় মিঠু দৌড়ে ওদের দু'জনার মাঝে এসে দাঁড়াল। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে মিঠু মৃদুলদাকে লক্ষ করে বলল, 'এত লোক আছে এ বাড়িতে, তোমার কী। জাহান্নামে যাক সব। যাও, ঘরে যাও। পরক্ষণই ভূষণ আর চীনার দিকে রাগান্বিত চোখে চেয়ে বলল, 'আপনারা কি অধিকারে এ বাড়িতে ঢুকেছেন?'

সে কথা শুনে কুচ্ছিৎ ভঙ্গিতে হাসে ভূষণ আর চীনা।

চীনা চোখ নেড়ে বলে, 'সে কথা ওই ওদের জিজ্ঞেস করুন না।' বলেই বিজন আর ঘণ্টুকে দেখিয়ে দেয়।

বাড়ির প্রধান যারা তারা মিঠুর এ ধরনের ব্যবহারে নিজেদের আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না।

তাসের আসর থেকে প্রিয়নাথ বেরিয়ে এসে বললেন, 'আপনারা বাইরে যান, আমাদের বাড়ির ব্যাপারে আপনাদের নাক গলানোর প্রয়োজন নেই।'

পুলিনকাকাও বিজন আর ঘণ্টুকে ধমকে বলে উঠলেন, 'তোরা মানইজ্জত সব খুইয়ে বসেছিস। কার অন্যায়, কার ন্যায় সে বিচার এরা কেন করতে আসবে।'

বিজন উত্তর দেয়, 'ওরা আমার ফ্রেণ্ড।'

মৃদুল রাগী গলায় বলে, 'বেশ ফ্রেণ্ডশিপ পাতিয়েছ তো ভূষণ আর চীনার সঙ্গে। ওদের এ পাড়ায় কে চেনে না, বলতে পার? যাদের নামে লোকে থুতু ছেটায়, তারাই হল তোমার ফ্রেণ্ড। বহুত আচ্ছা। চালিয়ে যাও। আজ ওরা বাড়ির দোরগোড়া পর্যন্ত এসেছে, এবার দেখবে বাড়ির ভেতরে ঢুকবে।'

'আলবাৎ ঢুকবে। তোর বন্ধু অরূপ ঘেয়ো পরিবারের ছেলে হয়ে যদি বাড়িতে নষ্টামি ধস্টামি করতে পারে তো আমার বন্ধুরা কেন পারবে না।' বিজন উত্তর দেয়।

মৃদুলদা সরোষে বলে, 'ওর পায়ের নখের যুগ্যিও যদি হতে তো তোমায় শ্রদ্ধা করতাম।'

'আরে যা, যা। বেশি বাতেলা দিস না। এখনও আসল পয়েণ্ট বলিনি শুধু বাড়ির মুখ চেয়ে। বেশি ঘাঁটাস নি আমায় মৃদুল।'

মৃদুল কী মনে করে চুপ করে গেল। বিজনও একটু পরে ভূষণ আর চীনাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

যাওয়ার সময় চীনা ক্রুর চোখ করে মৃদুলকে লক্ষ করে বলল, 'শিগগিরই তোর রেশনকার্ড জমা পড়ে যাবে রে!'

মৃদুলও তার প্রতি উত্তর দিয়ে বলল, 'সেটা নিজের হয় কিনা তাই ছাখ। মস্তানি আর যেখানেই করিস, দ্বিতীয়বার যদি এ বাড়ির চত্বরে দেখি তো, তোদের দশাও হবে তোদের গুরু সেনাপতির মত।'

মৃদুল এবার ঘণ্টুর মুখোমুখি হয়ে বলল, 'একটু আগে তোকে কাকা বলেছি মনে রাখিস, এবার থেকে কিন্তু শুয়োরের বাচ্চা বলে ডাকব। মনে রাখিস, সোমনাথ মুখুজ্জের ছেলে আমি। বেশি কিছু করবি তো ওই চোখ দুটো খুবলে নেবো কোনদিন।'

ঘণ্টু ও তিরিক্ষি মেজাজে উত্তর দেয়. 'শুনলে তো তোমরা মৃদুলের কথা। আমি কিন্তু থানায় ওর নামে একটা ডাইরী করে রাখবো। লান্টু আয় তো আমার সঙ্গে।'

লান্টুর নেশা তখন তুঙ্গে। বলে. 'যা কচ্ছো, নিজে কর, আমায় মিছিমিছি এর মধ্যে জড়াচ্ছ কেন?'

প্রিয়নাথ জেঠা আর পুলিন কাকা এক সঙ্গে ঘণ্টুকে মোলায়েম সুরে বলেন, 'তুই বড়, ছেলেছোকরাদের কথায় অত গুরুত্ব দিলে কী চলে। যা ঘরে যা।'

'যাব, নিশ্চয়ই যাবো। তবে তার আগে শুনে নাও, মৃদুল ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আমি ওর আর এখন থেকে কেউ নই।'

মৃদুলদা থুতু ছিটিয়ে বলে 'সম্পর্ক ফলাতে এসেছে। আহা. কী কাকারে আমার।'

ঘণ্টু গজ গজ করতে করতে মিঠুর দিকে চেয়ে ঠোঁট চাটতে চাটতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলার ঘরে চলে যায়।

মৃদুলকে ঠিক এসময় বাইরে বেরুতে দেখে মিঠু এগিয়ে এসে বলে 'এখন না বেরুলেই নয় মৃদুলদা।'

মৃদুলদা কী মনে করে বলে 'আমাকে বেরোতেই হবে মিঠু।'

মিঠু চাপা গলায় বলে, 'যা বলার আমাকে বল, প্রয়োজন হ'লে আমি তোমার সাহায্য করতে পারি।

মিঠুকে সঙ্গে করে মৃদুলদা নিজের ঘরে চলে যায়।

মা আমাকে দেখে বলেন, 'তোর কী লজ্জা সরম বলে কিছু নেইরে সুয্যি।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাকে সব কথা বলি।

মা শুনে এগিয়ে আসতেই আমি করুণ গলা করে বলি, 'আর এগিয়ো না মা।'

মার বুঝতে বাকী থাকে না। কোনো কথা না বলে, ঘরের ভেতরে গিয়ে দুহাঁটুর মাঝে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকেন।

মিঠু দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকেই বলে, 'দাদা তোকে এক্ষুনি চোরবাগানে যেতে হবে। যা যা হয়েছে সব রত্নেশ্বর কাকাকে বলবি। খুব সাবধান। যদি পারিস তো অরূপকেও খবরটা দিয়ে দিস।

আমি বিস্মিত চোখে চেয়ে বলি, 'চোরবাগানে? ও বাড়িতে আমার যাওয়া চলে না মিঠু। তার চেয়ে বরং অরূপের ঠিকানা দে. ওকে দিয়েই না হয়…

মিঠু কী সব চিন্তা করলো। পরে ও আমাকে অরূপের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বলল, 'অরূপ আর মৃদুলদার জন্য আমার খুব ভয় করছে রে।'

আমি খুব বিজ্ঞের মত ভঙ্গি করে বলি, 'ভয় কিরে বোকা? আমাকে এত অপদার্থ মনে করিসনে।' বলেই ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই।

মিঠুর কথা

জানাজানি যখন হয়েই গেছে, তখন আর দুশ্চিন্তা করে লাভ কী? এখন আমার সব চিন্তা অরূপ আর মৃদুলদাকে নিয়ে। মা তো রোজ ঘুমের ওষুধ খায়, আজ আমিও একটা বড়ি চেয়ে নেব নাকি মার কাছ থেকে! কিন্তু মা'র কাছে সে সাহস হ'ল না।

বাবা শুধু বললেন. 'মাথা গোঁজার দিন কয়েকের ঠাঁইও যদি পেতাম তো, এই অলুক্ষুনে বাড়ি আজই ছেড়ে দিতাম। মানুষ আত্মীয় স্বজন নিয়ে জড়িয়ে মিশিয়ে থাকে। এ বাড়িতে তার উপায় নেই। স্বয্যু ক'দিন আগেই বলছিল. দেওঘর যাবার কথা। গেলে ভালই হ'ত। হতচ্ছাড়াদের নোংরামো আর সহ্য হয় না।'

মা থমথমে মুখ নিয়ে বললেন 'শুধু নিজের নিয়েই আছ। এ বাড়িতে আর একজনকে তোমার মনেও পড়ল না?'

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কথা বলছো?

মা বলেন, 'না বুঝে থাকলে শুনে কাজ নেই।'

'মিছিমিছি রাগ করছো চারু।

মা এর কোন জবাব দেন না।

বাবা জিজ্ঞেস করেন, 'স্বয্যু গেল কোথায়? রাতে বাড়ি না থাকা আমার ভাল লাগে না।'

মা উত্তর দেন, 'সময়ে সেটা ভাবতে পারতে। এখন আর দুঃখ করে লাভ কি?'

'সবই বুঝি চারু, সবই বুঝি! কিন্তু কি করবো বলো। আজ যা হ'ল, তাতে বুঝতে পারছি, মিথ্যে আভিজাত্য আঁকড়ে না থেকে গাছতলায় থাকাও ভাল।'

মা বললেন, 'ঠিকই বলেছ?'

মা'র উত্তর শুনে আমি একটু অবাক না হয়ে পারি না। এমন করে বাবার কথাকে মা এত সহজে মেনে নেবেন. এটা ভাবতেই পারি না।

বাবা বলেন 'রাস্তায় যারা থাকে তারা আমাদের থেকে অনেক সুখে থাকে চারু।'

বাবা ও মা'র কথা বলার মাঝে আমি কেমন যেন এক নতুনত্বের স্বাদ পাই। বোধ হয়, এক ধরনের শ্রদ্ধা জন্মাল।

বাবা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'আর কার কথা ভাবার কথা বলছিলে চারু?

'কেন মৃদুল।'

বাবার উত্তর খুব অদ্ভুত শোনায়। বলেন 'চিরটাকাল নিজের কথাই ভেবেছি, হঠাৎ স্বভাব পাল্টান বড় কঠিন।'

মা এর কোন উত্তরই দেন না।

বাবা ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছিলেন। এত অস্থিরতার কী কারণ থাকতে পারে বুঝে পাই না।

মা বললেন, 'একটু স্থির হয়ে ব'সো না।'

বাবা মা'র থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসে বলেন, 'ওরা এত নিচে নামতে পারে ভাবি নি।'

এবারও মা কোন কথা বলেন না। বাবার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থাকেন। বুঝি বা বলতে চান, আগুন যখন অন্যের বাড়িতে লাগে, আমরা শুধু মৌখিক সমবেদনা জানিয়েই নিস্তার পাই, আর সে আগুন যখন নিজের ঘরে লাগে, তখনই আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি।

বাবা বলেন, 'যদিও এ সমাজে মেয়ের ব্যাপারে বাপের দায়িত্ব বেশি, তবু আমি আজ মিঠুর সব ভার তোমাকেই সঁপে দিলাম। আভিজাত্যের দৌড় কত তা তো দেখছি। আমার বড় সাধ মিঠুকে দিয়ে আমরা পালাবদল শুরু করি।'

মা বলেন, 'একথা আমিই তোমাকে বলবো ভেবেছিলাম, তুমি বললে, আমি. বাঁচলাম।'

যে স্বপ্ন বাবা ও মা দেখছেন, তাকি আমিও দেখি না। কেন যেন আমারও মনে হয়, আমি এ বাড়িতে জন্মেছি নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দেবার জন্তই। কিন্তু ভয় তো আমারও কম নয়। যাকে নিয়ে আমার এত আশা সে যদি মুখ ফিরিয়ে চলে যায়! মৃদুলদার কাছ থেকে শুনেছি, ও কিছুদিনের মধ্যেই বেশ সম্মানিত পদে চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাবে। তা যাক। কিন্তু ভূষণ আর চীনাকে দেখে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠছে। ওদের যা পরিচয় পেয়েছি, তাতে কী নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব? মৃদুলদাই বা কী? একক ভাবে কি

সংগ্রাম চালানো যায় ? বাড়ি শুদ্ধু লোক কেন যে ওকে দেখতে পায় না, তা বুঝে পাই না। মহৎ প্রাণ বললে হয় তো বা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে, উনি উদার, বিচক্ষণ, বিবেকবান। ঠাকুরপুকুরের হাসপাতালে আর প্রতিবন্ধীদের জন্য একটা প্রতিষ্ঠানে মৃদুলদা প্রায় লাখ খানেক টাকা নিঃশর্তে দিয়েছেন। ও দুটো প্রতিষ্ঠানের কাছেই নিজের কথা গোপন রাখতে বলেছেন। নাম কেনার সস্তা মোহ মৃদুলদার নেই। ওসব টাকা যে বেআইনি নয় সবই বাপ-ঠাকুর্দার রোজগারের তার সঠিক হিসেব দিয়ে ও দুটো প্রতিষ্ঠানের কর্ম-কর্তাদেরও নিশ্চিন্ত করেছেন।

এত কম বয়সে মৃদুলদার মত মানসিকতা ক'জনার থাকে ? আর সে জন্যই তো ওঁকে শ্রদ্ধা না করে পারিনা।

অরূপের সঙ্গে মৃদুলদার একদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল।

মৃদুলদা বলেছিলেন, 'যদি মুখ ফুটে বল অরূপ, তাহ'লে তোমার জন্য আমি সর্বস্ব উজার করে দিতে পারি ?'

তুমি নিজে বড় স্বার্থপর অরূপ তাই নিজের ছাড়া আর কারো কথা তোমার মনেই পড়ে না।'

অরূপ সহাস্যে বলেছিল, 'আমার সবকিছুর পেছনে তুমিই আছ মৃদুল, এটা ভুলে যেও না।'

বিস্ফারিত চোখে মৃদুল উত্তর দিয়েছিল, 'এই তো। সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে মুক্ত হচ্ছো।'

'মুক্ত হব কেন ? আমার ওপরে তোমার কী এতটুকুও বিশ্বাস নেই ?

'বিশ্বাস আছে বলেই তো তোমাকে সব কিছু উজার করে দিতে পারি। ভেবো না, ওসব করে আমি তোমার কাছে মহৎ হতে চাই। ওসব কাঙালপনা আমার নেই।'

অরূপ সহজ হয়েই উত্তর দিয়েছিল. 'আগেও বলেছি, এবারও বলছি, বড়-ঘরের একটা চাকরি আমার বাঁধা। পুরোহিত বংশে এটাকে তুমি কি ভাবে নেবে জানি না। তবে আমার মনে হয়, তুমি খুশিই হয়েছো শুনে।'

মৃদুল সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল খানিকক্ষণ অরূপের দিকে। বলেছিল, 'জানতুম তুমি সকলকে টেক্কা দেবে। এখন শেষ তুরুপের তাসটা ঠিকমত খেলতে পারলেই বাঁচি।'

সঙ্গে সঙ্গে অরূপ আমাকে দেখে সলজ্জ ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিল, 'দেখাই যাকনা।'

বাথরুমে যাবার অজুহাতে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াই। দেখি, মৃদুলদার ঘরে আলো জ্বলছে। বাড়িটা নিঝুম, নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। দ্রুতপায়ে মৃদুলদার ঘরের দরজায় টোকা দিতেই মৃদুলদা আমাকে এই এত রাতে দেখতে পেয়ে বলে, কী ব্যাপার মিঠু?'

'আপনি ঘুমোন নি দেখে একটা কথা বলতে এলাম। সময় কম। আপনার কোন চিন্তা নেই। দাদাকে সব বলেছি। ও চোরবাগানের বাড়িতে যাবে না, তবে আপনার বন্ধুর ওখানে যাবে। একটু সাবধানে থাকবেন মৃদুলদা। আমাদের জন্য অত ভাববেন না।'

মৃদুলদা আমার মাথায় হাত ছোঁয়ায়। বলে, 'সুযু্য কী সব ঠিক মত করতে পারবে?'

আমি ওঁর উৎকণ্ঠা দূর করার জন্যই বলি, 'দাদাকে যতটা নির্বোধ ভাবেন, ও কিন্তু ঠিক তেমন নয়। তাছাড়া ওর শরীরে শক্তিও আছে যথেষ্ট। মনে হয় পরিবর্তনের হাওয়া ওকেও ছুঁয়েছে।' কথা কটি বলেই দ্রুত মৃদুলদার ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে আসি।

আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে রাতটা কাটালাম। চোখ দুটোয় জ্বালা জ্বালা ভাব। শরীরটাও ম্যাজম্যাজ করছিল। মুখ হাত ধোবার জন্য কলঘরে চলে আসি। ভেতরের বারান্দার একেবারে উত্তরের কোণে চলে গেলে বৈঠকখানা নজরে পড়ে। ওখান থেকে সামান্য ঝুঁকে বুঝতে পারি, দাদা বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে কাদা। মাঝে মাঝে ওর জন্য মন ভীষণ বিষণ্ন হয়ে যায়। ও কেন এরকম হ'ল? কেন ও মৃদুলদার ছিঁটে ফোঁটাও পেল না? গাঢ় করে শ্বাস ফেলে দ্রুত মুখ হাত ধুয়ে মৃদুলদার ঘরের দিকে এগোতে গিয়েই দেখি বাইরে বড় একটা তালা ঝুলছে। এ বাড়ির কাউকেই তো মৃদুলদার প্রসঙ্গে কিছুই জিজ্ঞেস করা যায় না? ওখান থেকে সরে আসি। এত ভোরে মৃদুলদা কোথায় যেতে পারে? অরূপের কাছে কী? কী জানি, অরূপের চিন্তায় মৃদুলদা হয়তো সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি। না হলে কী চোরবাগানে রত্নেশ্বর কাকার কাছে গেছে? কিন্তু কাল রাতেই তো ওকে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করে এসেছি। দাদার ওপরে মৃদুলদার কী এতটুকুও বিশ্বাস নেই? না থাকারই কথা। এতদিন ধরে দাদার চরিত্রের যা নমুনা নজরে পড়েছে তাতে করে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

সময়ের পা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। এক এক করে মুখুজ্জে বাড়ির দরজা খোলার শব্দ হতে থাকে।

একটু পরেই ঝি-চাকরের কথায় ভরে যাবে।

গতরাতে যে ঘটনা ঘটেছে, তা কি সকলে মনে করে রেখেছে? মনে তো হয় না। কত কিই তো এ বাড়িতে ঘটে, দু-চার ঘণ্টা কী একবেলা তাই নিয়ে সকলে মত্ত থাকে তারপরই সকলেই সবকিছু বেমালুম ভুলে যায়। মুখুজ্জে বাড়ি ক্লিন্ন আর হত কুচ্ছিৎ হয়ে উঠতে থাকে।

মাকে বলি, 'দাদা রাতটা বৈঠকখানায় কাটিয়েছে।'

'ওকে ডেকে আন মিঠু। কেন যেন মনে হয়, ওকে আমরা ঠিক চিনতে পারিনি।'

এ-ও আর এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। দাদার জন্য মাকে এত বেদনার্ত হ'তে এর আগে আমি দেখি নি।

কথা না বাড়িয়ে বৈঠকখানায় ঢুকে দাদাকে সামান্য নাড়া দিয়ে বলি, 'মা ডাকছেন, আয় উপরে আয়।'

দাদা এই প্রথম বুঝি আমার দিকে তাকিয়ে বেশ প্রফুল্ল হাসি হাসে। বড় করে হাই তুলে শরীরের আড়মোড়া ভাঙে। বলে, 'তুই যা, আমি যাচ্ছি।'

আমাকে ঘরে ফিরে আসতে দেখেই মা বলেন, 'কি রে? সুয্যি উঠলো, না, ফের উঃ আহ্ করে পাশ ফিরে শুলো?'

'না, এখুনি আসবে', আমি উত্তর দিই।

বাবা রোজকার মত পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে ভোরের ট্রামে চেপে ধর্মতলা থেকে ঘুরে আসার জন্য বেরিয়ে যান। আগে রাতেও খাওয়া-দাওয়া সেরে ফাঁকা ট্রামে চেপে এসপ্লানেড ঘুরে আসতেন। এখন দিনকাল খারাপ হওয়ায় এটাতে ছেদ পড়েছে।

বাবার বয়সী লোকদের ট্রামে চেপে হাওয়া খাওয়ার মধ্যে এক ধরনের গর্ব আছে। বাসে চেপে কোথাও যাওয়া খুব একটা পছন্দ করেন না। বাসে নাকি কোন আভিজাত্য নেই! কি সে যে কী আছে, তা সঠিক আমার মাথায় ঢোকে না।

এ দিকে মা এ বাড়ির সকলের আগেই স্নান সেরে পুজো সেরে আসেন। লাল পেড়ে গরদের শাড়ি, এক ঢাল কালো চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে মা যখন নাট-মন্দিরে যান, তখন মা'র চেহারায় ফুটে ওঠে অপূর্ব শ্রী আর পবিত্রতা। চুলের শেষ প্রান্তে একটা গিঁট, আর ভেজা চুল থেকে টুপটুপ করে ঝরে পড়ে জল। সেই জলে গরদের শাড়ির অনেকটা অংশই যায় ভিজে। পুজো সারতে মা'র

প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। ঘরে এখন শুধু আমি একা। আমার আর কী করার আছে? আমি ঘরের মধ্যে ইতস্তত পায়চারি করতে থাকি। দাদা এসেই বলে, 'কইরে চা দে.।' কাজ পেয়ে যাওয়ায় আমি যেন স্বর্গ হাতে পাই। বলি, 'একটু বোস, চা আনছি।' চা করতে রান্না ঘরে ঢুকি। মনে মনে ভাবি এক্ষুনি কী মৃদুলদার কথা দাদাকে বলা উচিত হবে? কিংবা জানতে চাইব কী গতকাল রাতে অরূপকে ও ঠিক মত খবর পৌঁছে দিতে পেরেছে কী না? চোরবাগানে যেতে দাদার কিসের আপত্তি? এই সব যখন ভাবছিলাম, ঠিক তখনই কেতলিতে জল গরম হওয়ার শোঁ শোঁ শব্দ কানে এল। নিখুঁত ভাবে পেয়ালায় চা নিয়ে ঘরে এসে দেখি দাদা বাবা ও মা'র ছবির দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে।

'এই দাদা তোর চা'।

দাদা হঠাৎ কেমন চমকে উঠলো। সরল হেসে বলল, মা'র তুলনা নেই না রে মিঠু?'

আমি বলি, 'কেন বাবা কী একেবারে ফেল্‌না নাকি? এমন ঋজু চেহারা সচরাচর বাঙালীদের মধ্যে ক'জনকে দেখা যায়?'

দাদা কথা বাড়ায় না। কাপে চুমুক দিয়ে বলে, 'বাঃ ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে।'

মা পুজো সেরে ঘরে ঢুকেই প্রসাদী ফুল সকলের মাথায় ছুঁইয়ে বলেন, 'এবার থেকে রাতে অন্য কোথাও থাকবিনা সুয্যি!'

দাদা মুখ নিচু করে বসে থাকে।

তোদের বাবা কাল কিন্তু তোকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিলেন।'

এবারও দাদা কোন উত্তর দিল না।

সুযোগ বুঝে বললাম, 'এত ভোরে মৃদুলদা কোথায় গেছে জানিস?'

দাদা সবিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, কি করে জানব বল? এই বোধ হয় প্রথম যে, ভোরের মুখ দেখলাম।'

'তোর ফিরতে কত রাত হয়েছিল।'

রাত হবে কেন? সাড়ে এগারোটার মধ্যেই ফিরেছি, ফিরে দেখলাম, দরজা বন্ধ মিছিমিছি তোদের ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে হ'ল না। বৈঠকখানা তো খালিই পড়ে থাকে। জোর খাইয়ে দিয়েছিল অরূপ। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি। এত গাঢ় ঘুম আমার খুব কমই হয়েছে।' এই পর্যন্ত বলেই দাদা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুই কত ভোরে উঠেছিস মিঠু?

আমি উত্তর দি, 'ব্রাহ্মমুহূর্তেই বলতে পারিস। সারা রাত আমার ভাল ঘুম হয়নি। কি যে অশান্তি!'

কথাটা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল বলেই বুঝি মা'র চোখে চোখ পড়ল। মা'র মুখের রেখা একটুও বদলায় নি, মাকে খুব সহজে চেনা যায় না।

দাদা বলল, 'কেন যে ও দুটো বজ্জাত মৃদুলদার পেছনে লেগেছে বুঝতে পারি না। যে কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই, তাকে উপদ্রব করার কী কারণ থাকতে পারে। ওরা ভূষণ আর চীনাকে এনে শুধুই কী সকলকে ভয় দেখাল?

মা বললেন, 'এ সময় তোর মামাকে একটা খবর দিতে পারলে ভাল হ'ত। কিন্তু ও যে ঘাটশিলাতে থাকবেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। দাদা যদি এ সময় পাশে থাকতো তো আমি খুব ভরসা পেতাম।'

নীলআকাশের সৌন্দর্য ছিল মা'র মুখে। একখণ্ড কালোমেঘে সে মুখটায় ছেয়ে গেল মুহূর্তে। বাবা ফিরে এলেন প্রাতঃ ভ্রমণ সেরে। মা দ্রুত বাবার জন্য চা করতে রান্নাঘর মুখো হলেন।

ঠিক তখনই দাদা বলল 'বিজন ঘণ্টুকে বলছিল কিছু একটা করে ফেলে রাখলেই হ'ল, যা খুনোখুনির রাজত্ব চলছে। সবাই ভাববে ও রাজনীতির শিকার। দু'দলই পতাকা ফেস্টুন নিয়ে সোরগোল বাঁধাবে, প্রত্যেকেই প্রমান করতে চাইবে মানুষটা ওদের সমর্থক।'

বাবা এসব শুনে বলেন, 'এসব আবার তুই কবে থেকে বুঝতে শিখলি রে সুয্যি?'

দাদা চট জলদি উত্তর দিল, 'কে আর শেখাবে। সবই দেখছি নজরেও পড়ছে। আমার কী, মুখুজ্জে বাড়ির সবাই ভাবে, আমি নিরেট গর্দভ। কেই বা আমার কথার মূল্য দেয় বলো?'

'আহা তা ভাবছিস কেন? হঠাৎ এ সময় তুই এসব বললিই বা কেন?'

'ওদের মধ্যে যখন এসব কথা হচ্ছিল, আমি যে ঘুমোই নি ওরা টের পায়নি। কিন্তু আমার মনে হয় বিজনটা মিছিমিছি এসব বলেনি।'

মা সে সময় চায়ের পেয়ালা বাবার সামনে তুলে ধরে বলেন 'চলইনা আজই আমরা দেওঘরে চলে যাই। ক'দিন বেশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে ওখানে।'

ঠিক-সে সময়ই দু'তিনজন ছেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকে 'কে আছেন কে আছেন' বলে হাঁক ডাক শুরু করল। মা বললেন, 'ত্যাখতো সুয্যি কে?'

দাদা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে বলল, 'দুর দুর। এ বাড়ির ভ্যানতারা আমার আর আর ভাল্লাগে না। মিঠু তুই দেখে আয় তো।'

'না থাক আমিই যাচ্ছি' মা বললেন।

বাবা বলেন, 'তোমার এত ব্যস্ততা কিসের। বাড়িতে হাজার গণ্ডা লোক আছে, কেউ না কেউ বেরবেই।'

হঠাৎ পুলিন কাকা বারান্দার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলকে শোনাবার জন্যই বললেন, শিগ্‌গিরই সকলে বেরিয়ে এসো। মৃদুলের বড় রকম এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

দাদা এক লাফে নিচে নেমে গেল। শ্যামল, মিহির, প্রিয়নাথ জেঠা আরও অনেকেই ছেলে ক'জনাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

দাদা জিজ্ঞেস করল 'কী হয়েছে, বলুন।'

পুলিন কাকা বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছেরে সুখ্যু। তোরা এক্ষুনি সকলে যা মেডিক্যাল কলেজের এমারজেন্সী ওয়ার্ডে। কারা যেন মৃদুলকে আধমরা ক'রে সিংঘি বাগানের কাছে ফেলে রেখেছিল।

বিজন গম্ভীর গলা করে বলল, 'বেশ ছিলাম, এবার পুলিশের তাণ্ডব শুরু হবে। শুধু আমিই নই, বাড়ির মেয়েরাও বেরিয়ে এসেছিল। সকলের মুখে-চোখেই উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

মা দৃঢ় গলায় বিজনের দিকে চেয়ে বললেন, 'সে সব পরের ব্যাপার বিজন। বাড়ির ছেলে হয়ে যা করার এক্ষুণি কর।'

বিজন স্পষ্ট গলায় উত্তর দিল, 'ও সবে আমি নেই। বাবু ইদানীং রাজনীতি করা লোকজনদের সংগে ওঠা-বসা করছিল।'

ঘণ্টু কাকা বলল, 'কে যে কার এ্যান্টি কে জানে। মৃদুলকে হয়তো ওর এ্যান্টি পার্টিই...'

মা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলেন 'সে সব বিচার করার সময় এখন নয়। তোমরা না যাও আমি যাব'। ছেলে ক'জনকে লক্ষ করে মা বললেন 'আপনারা কী ক'রে জানলেন, ও এ বাড়ির ছেলে?'

ওদেরই মধ্যে একজন শান্ত গলায় উত্তর দিল, 'আমরাই তো ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি। রোজই হেদোয় সাঁতার কাটতে যাই। প্রাণে বেঁচে আছে দেখে দেরি না করে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাই। ভদ্রলোকের সেন্স তখনও ছিল, ওঁর কাছ থেকে বাড়ির ঠিকানা জেনেছি। আমাদের কর্তব্য

খবর দেওয়া, তাই দিলাম। এখন আপনারা যা ভাল বুঝবেন, করুন।' বলেই ছেলে ক'জন চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই বিজন বলে উঠল 'আপনাদের তো এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া চলবে না। এ সব কীর্তি যে আপনাদের নয় তা কি করে বুঝবো।

ঘণ্টুকাকাও সে কথার সমর্থন করে বলল 'ঠিকই তো। পুলিনদা তুমি থানায় একটা ফোন করো তো।'

ছেলে ক'জন এতটুকু উত্তেজিত হ'ল না। বরং সে কথা শুনে হেসেই ফেলল। একজন বলল, 'আপনারা পুরোন কলকাতার বাসিন্দা তাই না? আপনাদের পক্ষে এ ধরণের কথা বলা বেমানান নয়। চল চল যত্ত সব কাওয়ার্ড।

ওরা ঋজু পায়ে বাড়ির বাইরে বেরুতে বেরুতে বলল 'তবু বলছি আপনাদের মধ্যে কেউ ভদ্রলোকের একটু খোঁজ-খবর করুন। বিকেলে আপনাদের সঙ্গে ফের আমাদের দেখা হবে।

সূয্যি ক্ষিপ্ত হয়ে বিজনের কলার চেপে ধরে বলল, 'মৃত্নলদার যদি কিছু হয় তো, এই হাতে তোর মাথা আমি গুঁড়িয়ে দেবো।'

দাদা এত জোরে বিজনের কলার চেপে ধরছিল যে ওর সারা শরীরের রক্ত মুখে এসে জমে গিয়েছিল। মা বললেন 'ছেড়ে দে সূয্যি ও সব ছুঁচোর গায়ে হাত তুলিস নি।

সূয্যি বলল, 'কে কে আমার সঙ্গে যেতে চাও বল।'

শ্যামল মিহির প্রিয়নাথ জেঠা পুলিনকাকা এমন কি লাণ্টু পর্যন্ত দাদার সঙ্গে যেতে রাজী হল।

দাদা এই ফাঁকে আমাকে বলল 'পারিস তো রত্নেশ্বর কাকা ও অরূপকে তুই একটা খবর দে। মা-দাদা এবং বাড়ির আর তু'চারজকে দেখে আমার মধ্যেও একটা জেদ চেপে যায়।

ওরা হাসপাতালে বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরই আমি বেরুতে যাব ঠিক সেই সময় চীনাকে এ বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখি। চীনা আমাকে আগের দিনই লক্ষ করেছিল। ত্যাড়ছা চোখে ও আমাকে দেখে বেশ ভাল মানুষের মত বাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়ে 'বিজন বাবু বিজনবাবু' বলে ডাকাডাকি শুরু করল। আমি ওসবের গুরুত্ব না দিয়ে একটা রিক্সা চেপে চোরবাগানের বাড়িতে ঢুকলাম। কি আশ্চর্য ওরা সকলেই দেখি আমাকে চেনে। বেশ ভদ্র, শান্ত ধীর স্থির ব্যবহার ওদের। এ বাড়িটাও শুনেছি দো'মহলা কিন্তু কোন

দিনই দেখার সুযোগ হয় নি। সিমলের মুখুজ্জেদের সঙ্গে এদেরও রক্তের সম্পর্ক আছে। তবু এদের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক। এই শত্রুতা চলে আসছে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে থেকে, কী তারও বেশি। এঁরা পরোপকারী, শিক্ষিত মার্জিত আর ঠিক বিপরীত হচ্ছে আমাদের বাড়িটা।

রত্নেশ্বর কাকাকে এর আগে কখনও দেখি নি।

আমাকে উনি পরম সমাদর করে ঘরে নিয়ে গেলেন।

আমার মুখ-চোখে দারুন উৎকণ্ঠার ছাপ লক্ষ করেই উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই গণাদার মেয়ে, তাই না। দাঁড়াও-দাঁড়াও, তোমার নামটা মনে করার চেষ্টা করি। হ্যাঁ মনে পড়েছে, মিঠু, ভাল নাম তাপসী। সূর্যকান্ত দাদা। ওকেও দেখেছি দূর থেকে, কখনো আলাপ হয় নি। যাক্ গে, কী খবর বলো?'

আমার শরীরটা বোধ হয় থির থির করে কাঁপছিল। সেটা রত্নেশ্বর কাকার নজর এড়াল না।

রত্নেশ্বর কাকা বলেন, 'কি হয়েছে মিঠু, নির্ভয়ে বলো?'

আমি মৃদুলদার খবর যা-যা শুনেছি সবই খুব সংক্ষেপে বলেই বললাম, 'দাদা আপনাকে সব বলতে বলেছে। এখন ভাল-মন্দ সব আপনার ওপরেই নির্ভর করছে। ও বাড়ির লোকদের আমি একটুও বিশ্বাস করি না। ওরা সাপের থেকেও ভয়ানক।'

রত্নেশ্বর কাকা উঠে গিয়ে ফোন তুলে ডায়াল করতে লাগলেন। আমি বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলাম, রত্নেশ্বর কাকা কোন একজন ক্ষমতাশালী লোকের সঙ্গে আজকের ঘটনার কথা বলে যাচ্ছেন। হঠাৎ ফোনের মুখটা চাপা দিয়ে রত্নেশ্বর কাকা বললেন, 'ও বাড়ির কার কার ওপর তোমার সন্দেহ হয় মিঠু।'

আমি বিজন আর ঘণ্টুর কথা বলেই ভূষণ আর চীনার ব্যাপারটাও চট করে সেরে ফেললাম। শুধু তাই নয়, এখানে আসার মুখে চীনা যে বিজনদাকে ডাকছিল সেটাও বলতে ভুল হল না।

রত্নেশ্বর কাকা ফোনে, ওদের সকলের নাম করেই বললেন, 'ইমিডিয়েট একটা এ্যাকশন নিন, ওরা হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট ক্রিমিন্যাল।'

ফোন নামিয়ে রেখে রত্নেশ্বর কাকা সস্নেহ ভঙ্গিতে বললেন, 'জান না মিঠু, তোমরা আমাদের কত আপন। মৃদুলের ঠাকুর্দার দৌলতে আমরাও যে যার করে কম্মে খাচ্ছি। সে সব পরের কথা। কোন এক সময় তোমার বাবা-মা'র কাছ থেকে আমাদের রেষারেষি, শত্রুতা, যাই বলনা কেন, জেনে নিও। এখন বলো, কি খাবে?'

আমি বলি, এখন আমি কিছুই খেতে পারবো না কাকা।'

'তোমার মাকে আমরা ভীষণ শ্রদ্ধা করি। বলেই রত্নেশ্বর কাকা বাড়ির মহিলাদের ডাকলেন।

সকলেই আমার পাশে এসে দাঁড়ান। কার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক এসব ওরাই বোঝাতে থাকেন। মিষ্টির প্লেট এগিয়ে দিয়ে আমারই সম্পর্কিত এক জেঠাইমা বলেন, 'এই প্রথম এলে. একটু মিষ্টি মুখ কর মিঠু।' কথা বলার ভঙ্গিতে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। অত্যন্ত আন্তরিক বলে মনে হয় আমার। আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে।

উনিই আমাকে ওঁর শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বলেন, 'কোন ভয় নেই। আমরা সকলেই মৃদুলের পেছনে আছি যেমন ঠিক তোমাদের পেছনেও থাকব।'

রত্নেশ্বর কাকা এ সময় ঘরে ছিলেন না। বাইরে থেকে রত্নেশ্বর কাকার গলা আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, রত্নেশ্বর কাকা কাকে যেন বলছেন. 'তোমাদের ওপর যে দায়িত্ব ছিল. তা কেন ঠিক ঠিক পালন কর নি। মৃদুলকে আমিই বলেছিলাম, আমাদের লোক সর্বক্ষণ ওদের চোখে চোখে রাখবে। ছি ছি, এতটুকু কর্তব্য বোধ নেই তোমাদের।'

কথা শেষ করে রত্নেশ্বর কাকা আরও দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'চটপট খেয়ে নাও মিঠু। আমাদের এখন অনেক কাজ। তুমি এখন কোথায় যাবে? বাড়ি না অন্য কোথাও?'

'অরূপের কাছে।'

'সে কে?'

'মৃদুলদার বন্ধু।'

রত্নেশ্বর কাকা মুহূর্তেই কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'বুঝেছি। তুমি যাও। ওরা কেউ না কেউ তোমার নজর রাখবে।'

চোরবাগানের বাড়ি থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন সূর্যের তেজ একটু বেড়েছে। আমি ধীর পায়ে অরূপের বাড় মুখো রওনা হলাম।

অরূপের জন্য একধরণের নিজস্ব অধিকার বোধই সম্ভবত আমাকে ওর বাড়ি মুখো করল।

অরূপ আমাকে দেখে কী ভাববে? ওর বাড়ি এসে শুনি অরূপ নেই। যাঁর কাছ থেকে এ খবর পেলাম, তিনি অরূপের মা।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিই মিঠু, তাই না?'

আমি কী মনে করে ওঁকে প্রণাম করে বলি, 'হ্যাঁ। আমি এসেছিলাম অরূপদাকে বিশেষ একটা খবর দিতে।'

'জানি সে খবর তোমার দাদা দিয়ে গেছে, খবরটা শোনার পর থেকেই আমিও অস্থির হয়ে আছি।'

এ কথা শুনে দাদার সম্পর্কে বিস্মিত না হয়ে পারি না। ওকে এতদিন আমরা আস্তাকুর ভেবেই এসেছি। ওরও যে মান-অভিমান, সুখ-দুঃখ বলে কিছু থাকতে পারে সেটা একবারও ভাবি নি। এবার দাদার সম্বন্ধে কেন যেন আমি বেশি রকম ভাবতে শুরু করি। অরূপের মাকে প্রণাম করে বাড়িতে এসে দেখি, শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

আমি ভারী পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে দেখি, বাবা বারান্দায় দুশ্চিন্তা-গ্রস্তভাবে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই বাবা খুব চাপা গলায় বললেন, 'শিগ্‌গির ভেতরে আয়'।

'মা কোথায়'?

'হাসপাতালে'।

ঘাম দিয়ে জ্বর নেমে যায় যেন। বেশ স্বস্তি বোধ করি, বাবাকে সরাসরি প্রশ্ন করি, 'এমন কচ্ছো কেন? ফের কিছু ঘটেছে নাকি?'

বাবা খুব চাপা গলায় উত্তর দেন, 'এ বাড়ির ইতিহাসে যা কখনও হয় নি, তাই হয়েছে। পুলিশে পুলিশে ছেয়ে গিয়েছিল। বিজন, ঘণ্টু, লাণ্টু, শ্যামল, পরাশরদের পুলিশ এ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। বাড়ি শুদ্ধু লোক এখন আমাদের বিপক্ষে।'

অসম্ভব সুখানুভূতিতে আমি তলিয়ে যাচ্ছি যেন। এ যে অভাবিত ব্যাপার। বাড়ির লোক গুলোকে তো চিনি, ওদের ভয় পাই না। এ সবের পেছনে যে কার হাত আছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। আমি জিজ্ঞেস করি, যখন ওদের ধরে নিয়ে যায়, তখন তুমি ছিলে?'

'হ্যাঁ। বাড়িতেই যত লাফ ঝাঁফ। পুলিশের কাছে একেবারে কেঁচো। সব কিছুই নির্ভর করছে মৃদুলের স্টেটমেণ্টের ওপর।' বাবা বলেন।

'তা না হয় পরে হবে। বাড়ি শুদ্ধু লোক আমাদের বিপক্ষে, তা তুমি বুঝলে কী করে?'

মৃদুলের খবর নিতে সূয্যি গেছে, সেটা বাড়ির কর্তব্য বলেই ধরেছে সবাই।

কিন্তু তুই আর তোর মা'র চলে যাওয়াটা ওরা কেউ-ই ভাল মনে নেয় নি। পুরোন কাসুন্দি ঘেঁটেছে। বাড়ির মেয়ে-বউয়ের এত বাড়াবাড়ি নাকি মুখুজ্জেদের সম্মান হানির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাটাছেলেরা থকেতে মেয়েদের চুপচাপ থাকাই নাকি ভাল।'

আমি বলি, 'যারা একথা বলেছে, তাদের তো তুমি চেনো?'

'চিনি বই কী। একজন বিজনের বাপ সুবল, আর দুজন শ্যামল ও লাল্টুর বাপ।'

সে কথায় আমি হেসে ফেলি। ভিজে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে উত্তর দি, 'দুর দুর! ওগুলোকে অত পাত্তা দিচ্ছো কেন? পাড়ার কোন লোকটা ওদের সার্টিফিকেট দেবে শুনি? ক'দিন আগেই না শান্তি মুদি বাড়িতে এসে বিজনের বাপের সঙ্গে হল্লোড় করে গেল। চিট, ধাপ্পাবাজ বলে কত কী না বলল। আসলে মুরোদ নেই এক কণাও, শুধু মুখে বড় বড় কথা একে সিমেণ্টের পারমিট করে দিচ্ছে, ওকে চাকরি করে দিচ্ছে, এই তো ওদের চরিত্র। কত লোকের সর্বনাশ করেছে বলো? আমার সামনে দাঁড়াক দেখি, ঝেঁটিয়ে ওদের বিদেয় করবো না!'

বাবা আমার কথা শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করেন। বলেন, 'মিঠু রান্নাতো কিছুই হয় নি। ওরা কতক্ষণে ফিরবে কে জানে। তুই যা পারিস একটু বুঝে সুঝে করে ফেল না?'

আমি বলি, 'মা'র অনুমতি আগেই পেয়েছি, এবার তুমি দিলে। একটা ব্যাপারে মন খুব খারাপ হয়ে আছে। আমিই শুধু মৃদুলদাকে দেখতে গেলাম না।'

বাবা আন্তরিক গলা করে বলেন, সকলের একসঙ্গে ভিড় করার কী আছে? তেমন যদি দেখি, তো, বিকেলে তোকে নিয়েই আমি যাব।'

বাবা-মা-দাদার পরিবর্তনের কথা মনে পড়তেই কেমন আবেগ এসে পড়ে আমার। দু'চোখ জলে ভর্তি হয়ে গেলেও, বাবাকে সেটা বুঝতে দিই না। এ যে আমার নিজস্ব সম্পদ, একে কী লোক সমক্ষে প্রকাশ করা চলে?

শেষ কথা

দু'মাস পার হয়ে গেল। প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তনই নজরে পড়ে না।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, দিন থেকে রাত জোয়ার ভাঁটার খেলা, জন্ম-মৃত্যু, মিলন-বিরহের অনিন্দ্য সুন্দর লীলা এসবই তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করলো।

মুখুজ্জে বাড়ির মৃদুল ফিরে এল প্রায় জীবন্মৃত হয়ে। যতদিন ও বেঁচে থাকবে হয় তো ততদিনই ওকে পরমুখাপেক্ষী হয়েই থাকতে হবে। কিন্তু মৃদুল নিজের বেদনাকে এমনভাবে আড়াল করে রাখল, যা দেখে ওর প্রতি এক ধরনের অবিশ্বাসই জন্মায়।

দক্ষিণের ঘরে সেই যে তালা পড়েছিল, তা আর কেউই খুলতে এলনা। বাড়ির নাটমন্দিরে যেমন রোজকার পুজো হ'ত, তারও ছেদ পড়ল না, পুরোন পলেস্তরা খসিয়ে নতুন পলেস্তরা করলে বাড়ির চেহারা যেমন পাল্টে যায়, এক দিনেই তা অবিশ্বাস্য রকম ভাবে ঘটে গেল যেন।

প্রতিবন্ধীদের সেই প্রতিষ্ঠান থেকে লোক এলেন মৃদুলের খোঁজে। মৃদুল ওঁদের সাধ্যমত সমাদর করে বলল, 'আমার চেয়ে যারা বেশি হতভাগ্য তাদের দেখুন। অর্থের জোর, লোকবল কোনটারই অভাব নেই আমার।' ওঁরা দুঃখী মানুষের মত মুখ করে ফিরে গেলেন। খবরটা শ্যামাচরণ কিভাবে পেয়েছিল কে জানে। ও একদিন এসে হাজির হল। চারু দেখে তো অবাক বলল 'এ কী চেহারা হয়েছে তোর দাদা?'

শ্যামাচরণ হেসে বলল, 'তুইও দেখছিস ঠিক মা'র মতন। আসার সময় হাওড়া স্টেশনে ওজন নিলাম। সামান্য হের-ফের হয়েছে। শরীরের মেদ এ ক'মাসে সব ঝাড়িয়ে ফেলেছি।'

চারু নির্বাক চেয়ে থেকে বলল, মৃদুলের খবর তোকে কে দিল দাদা?'

'সূর্যকান্ত।'

চারুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুহূর্তে। বলল 'সুয্যি দিয়েছে খবর। এ-ও এক আশ্চর্য জনক ঘটনা।'

শ্যামাচরণ সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'তোর আমার ভাগ্যই দেখছি এক সুতোয় গাঁথা। ওদিকে আমি অক্ষম, অথর্ব, অসহায়দের নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়েছি, এখানেও তুই ঠিক সেরকম মানুষদের নিয়েই জড়িয়ে মিশিয়ে থাকছিস।'

চারু ধীর গলায় উত্তর দেয় 'এটা আমার শ্বশুরের ভিঁটে, স্বামীর ঘর। এঁদের নিয়েই তো আমার সব সাধ-আহ্লাদ। শেষদিন পর্যন্ত যেন সাধ মিটিয়ে যেতে পারি দাদা।'

শ্যামাচরণ বলে 'তা অনেক আগেই টের পেয়েছি। মৃদুলের ওখানে আমাকে একবার নিয়ে চল।'

চারু করুণ গলায় বলে 'মৃদুল সব সইতে পারে কেবল সহানুভূতি আর করুণা ছাড়া।'

শ্যামাচরণ হাসে সে কথায়। বলে আমার কী সাধ্য ওকে সহানুভূতি জানাই। শুধু চোখের দেখা দেখবো বলেই, এত দূর ছুটে এসেছি। মিঠু কোথায়?

'ও এখন মৃদুলের সারাক্ষণের সঙ্গী।'

'সূর্যকান্ত?'

'প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল দেবে বলে অরূপের ওখানে গেছে।'

'যা শুনলাম, এর থেকে সুখের আর কিছু হয় না চারু।' একটু থেমে বলল 'আর রমেশ?'

চারু কিছুক্ষণ থতমত খেয়ে যায়। কেন না এ নামটার চল এ বাড়িতে একদম নেই। সলজ্জ ভঙ্গিতে চারু বলে, 'ও নামটা শুধু তুইই মনে রেখেছিস, আমারই কী ছাই মনে পড়ে এখন।' বলেই মন মাতান হাসি হাসল চারু।

শ্যামাচরণ স্থির চোখে চারুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ কী ভেবে শ্যামাচরণ বলল, 'জানিস চারু আমার ওই লোকজনেরা খুব খেটে অনেক ফসল ফলিয়েছে। ধান যা হয়েছে, তাতে এ বছরটা বেশ স্বচ্ছন্দেই চলে যাবে। আর আনাজপাতি যে কত রকমের হয়েছে কী বলবো তোকে। ওদের দেখি আর ভাবি, আমার থেকে সফল সুখী মানুষ আর কে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যে আনন্দ পাই, কী বলব। সংসারী মানুষদের সুখের ব্যাপারটা আমি সঠিক বুঝি না, কিন্তু, এই যে ছন্নছাড়া মানুষগুলোকে নিয়ে আমি রয়েছি, তার সুখই আলাদা। একে আমি বলি সৃষ্টির সুখ। ভাবছিস, নিজের সংসারের কথা বলছি না কেন। ও সব দায়িত্ব ঋত্বিকের মা-ই নিয়ে আমাকে ভারমুক্ত করেছে। ও আর এক ধরণের সুখ চারু।' বলতে বলতে মুখ-চোখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে শ্যামাচরণের।

শ্যামাচরণের শেষ কথাগুলো শুনে চারুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল মুহূর্তে।

চোরবাগানের মুখুজ্জেরা এখন ঘন ঘন আসে। কোন সঙ্কোচ, দ্বিধা বা জড়তার লেশমাত্রও ওঁদের এ বাড়িতে এখন আর নেই।

রত্নেশ্বর এ বাড়িতে এলেই প্রথমে বিজনকেই ডাকেন।

ও ডাক শুনেই শ্যামল, পরাশর, লাল্টু, প্রিয়নাথ, পুলিন সহাস্য মুখে এসে দাঁড়ায়।

বাড়ির মেয়েরাও উঁকিঝুঁকি মেরে রত্নেশ্বরকে দেখে।

রত্নেশ্বর বলেন, 'জান বিজন, মৃদুলকে মাদ্রাজে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাব ঠিক করেছি। যে ক'মাস ওকে ওখানে থাকতে হবে, তার সব দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।'

বিজন লাল্টুকে, লাল্টু পরাশরকে, পরাশর শ্যামলকে দেখে।

প্রিয়নাথ বলেন, 'আলবাৎ যাবে বিজন। এতে কোন কিন্তু থাকতে পারে না।'

পুলিনও সে কথায় সম্মতি জানান।

রত্নেশ্বর গম্ভীর মুখ করে বলেন, 'এখন সবই মৃদুলের ওপর নির্ভর করছে। ওর যা জেদ; যদি যেতে না চায় তো আমরা জোর করতে পারবো না।'

বিজন বলে, 'ও ভারটা আমাকেই ছেড়ে দিন না।'

সে জন্যই তো তোমাকেই আমি বেছেছি বিজন।'

ঠিক সে সময় সূর্যকান্ত কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে এখানে এসে হাজির হয়। সব শুনে জিজ্ঞেস করে সূর্যকান্ত, 'দিনক্ষণ কিছু ঠিক হয়েছে?'

'সেটা ঠিক করতে বেশি সময় লাগবে না।' বলেই সূর্যকান্তর পিঠে হাত রেখে বলেন, 'চল সূয্যি, মৃদুলকে একবার দেখে আসি।'

সূর্যকান্ত স্পষ্ট উত্তর দিল, 'আপনিই যান। মৃদুলদার ও চেহারা আমি সহ্য করতে পারি না। রত্নেশ্বর সাময়িক নীরব থেকে বলেন, 'সব কিছুকে সহজ ভাবে নাও সূর্য। তোমরা ইয়াং ম্যান, অত ভেঙে পড়লে কী চলে?'

সূর্যকান্ত গাঢ় করে শ্বাস ফেলে বলে, 'একটা গবেট, যাচ্ছে-তাই মানুষ ছাড়া আমি কী। আমার তো আপনার মত মনের জোর নেই। খুবই সাধারণ মানুষ আমি। রক্ত মাংসে গড়া। খুব অল্পতেই ভেঙে পড়ি।' বলেই ও চোখের জল মোছে।

বিজন এগিয়ে এসে সূর্যকান্তকে বলে, 'তুইও না হয় আমার সঙ্গে থাকবি সূয্যি। নইলে আমিই কি একা পারবো সব দিক সামাল দিতে।'

সূর্যকান্ত সাবিস্ময়ে বিজনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'চলো আজ সবাই মিলে আমরা মৃদুলের ঘরে যাই।' রত্নেশ্বর বলেন।

লাল্টু বলল 'বিজনদা যদি একা যায় তো খুব ভাল হয়। মৃদুলদা শুধু বিজনদাকেই খুঁজছেন দিন কয়েক হল। কত বলছি, বিজনদা কিছুতেই যেতে চাইছেনা।'

'কেন রে? যাস্‌নি কেন'? রত্নেশ্বর প্রশ্ন করেন।

বিজন চুপ করে থাকে। কোন উত্তরই দেয় না।

বিজন যে অপরাধী তা সকলেই এখন জেনে গেছে। তবুও মৃদুলের মুখ থেকে ওর নাম কেউ ই বের করতে পারে নি।

মৃদুলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন রত্নেশ্বর 'যারা এত বড় অপরাধ করলো তাদের ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে আর যাই হোক উদারতার কিছু নেই। তোমাকে ক্রিমিন্যালদের নাম বলতেই হবে।'

মৃদুল অত কষ্টের মধ্যেও মুখ বিকৃত করে নি। শুধু উত্তর দিয়েছিল সত্যিই বলছি, ওদের কাউকেই আমি এর আগে কখনও দেখিনি। শুধু সন্দেহের বশে কারও নাম বলাটা আমি মনে করি অন্যায়। ওদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব পুলিশের। ওদের ওপরেই ব্যাপারটা ছেড়ে দিলে ভাল হয় না কি?

রত্নেশ্বর বলেছিলেন 'তোমার কথায় যুক্তি আছে; তবু আমি বলছি, তুমি কিছু আঁচ করেছ নিশ্চয়ই।'

মৃদুল তার উত্তরে বলছিল, 'কাকা কতজন তো খুন করে ও সন্দেহের অবকাশে মুক্তি পেয়ে যায় সুতরাং আমার মনে হয় ওই চ্যাপটার ক্লোজ করে দিলেই ভাল হয়। একদিন তো আমার ঠাকুর্দাকেও কত দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে, তাই বলে কী বাবা-ঠাকুর্দা এ বাড়ির প্রতি মুখ ঘুরিয়ে ছিলেন। সম্পর্কের শিকড়কে কী অত সহজে নষ্ট করে দেওয়া যায়? বাবাকে একথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি শুধু হেসে বলেছিলেন 'না মৃদুল ওঁদের অবর্তমানে আমি যেন সকলকে নিয়ে সুখে দুঃখে আনন্দ-বেদনায় জড়িয়ে থাকি। তাই আমি বালিগঞ্জের বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে ঠেকেছি।

'এইসব কথাই মুহূর্তেই রত্নেশ্বরে মনে পড়ে যায়।'

হঠাৎ উনি বলে বসেন, 'ঠিক আছে, আজ কাউকেই মৃদুলের ওখানে যেতে হবে না, আমি একাই যাব।'

সূর্যকান্ত সে কথা শুনে হো হো করে হাসে। বড় প্রাণ খোলা হাসি।

সবাই যে যার এদিক-ওদিক সরে পড়ে।

সূর্যকান্তকে একা পেয়ে রত্নেশ্বর বললেন, 'মৃদুল সকলকে ক্ষমা করতে পারে, কিন্তু আমি পারি না। ওর এই অবস্থার জন্য যে বা যারা দায়ী তাদের আমি খুঁজে বের করবোই।'

সূর্যকান্ত বলে, 'সে হবে'খন। আগে আপনি আমাদের ঘরে চলুন তো?

রত্নেশ্বর কথা বাড়ান না। গাঢ় করে শ্বাসটেনে বলেন, 'চারু বউদি আর মিঠুর কাছে আমি চিরকাল অপরাধী থেকে যাব। সামান্য একটু অসতর্কতাই মৃদুলের এই সর্বনাশ করলো। থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। পরে

সূর্যকান্তর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চল তাহলে?'

ঘরে ঢুকেই সূর্যকান্ত অবাক। বলল মামা তুমি কখন এলে?

'ঘণ্টা খানেক হল' শ্যামাচরণ উত্তর দেয়।'

'মিঠু জানে তুমি এসেছ?

মিষ্টি হেসে শ্যামাচরণ উত্তর দেয়, 'ফ্লোরেন্স নাইটঅ্যাঙ্গেল? না সূর্য্য ও, এখনও টের পায় নি।'

সূর্যকান্ত খুব দরাজ ভঙ্গিতে হাসে। বলে সত্যি মামা মিঠু যা করছে, তার তুলনা নেই।'

চারু পাণ্টা বলে উঠলেন 'তুই কী কম যাস নাকি?'

সেকথায় সূর্যকান্ত বলে, 'ধ্যুস. আমি আবার একটা মানুষ নাকি?'

শ্যামাচরণ ওকে স্পর্শ করে বলল, 'নিজেকে অত ঘৃণা করতে নেই সূয্যু, ছোট ভাবতে নেই।'

সূর্যকান্ত হো হো করে হেসে বলে, 'এবার থেকে তা'হলে নিজেই নিজেকে পুজো করবো কেমন?'

সূয্যুর কথা শুনে রত্নেশ্বর বললেন, 'তা মন্দ বলে নি সূর্য। ব্যাপারটা যেমন নতুন হবে. তেমনি আমার মনে হয় নিজেকে বিশ্বাসী আর প্রত্যয়ী করে তুলতেও সাহায্য করবে।'

চারু খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'এদের সব কিছুই অদ্ভুত। আপনি সঙ্গে আছেন তা সূয্যু মনেও রাখে নি। দাদাকে পেয়ে খোস মেজাজে গল্প জমিয়ে দিয়েছে। ছি ছি, এ ভারি অন্যায়।'

রত্নেশ্বর সে কথায় হেসে উত্তর দিলেন, 'বিশ্বাস করুন বউদি. খুব ভাল লাগছিল ওদের কথা শুনতে. যাক্ গে আমার এখন ভীষণ চা তেষ্টা পেয়েছে. আপনার হাতের কিছুই জোটে নি এ কপালে, আজ সেই সুযোগ এসেছে।'

চারু বলল, 'সে কপাল তো আমারও হয় নি, আপনি বসুন'। বলেই রান্না ঘর মুখো হ'ল।

শ্যামাচরণের দিকে চেয়ে রত্নেশ্বর বললেন, 'একটা ব্যাপারে আপনার বোনের শ্বশুর মশাই আমাদের হারিয়েছে। সে দুঃখ আমাদের ও বাড়ির সকলের।'

শ্যামাচরণ উত্তরে বলল, 'সবই জানি। এখন এতদিন পর ওসব ভেবে লাভ কী?'

লাভ লোকসানের কথা নয়। জানেন তো, আমাদের এ জাতটা মিথ্যে অহংকার আর আভিজাত্যের গর্বেই শেষ হয়ে যাবে।'

শ্যামাচরণ বলল, 'আমাকে আপনি দূরে সরিয়ে রাখছেন কেন? আমি আপনার স্নেহাস্পদের মতই।'

রত্নেশ্বর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন সে কথায়। বলেন, 'সেটা আমারই ভুল।

তোমার সম্পর্কে সব জানি। মাঝে মাঝে মনে হয়, তুমি মস্ত ভুল করেছ। আবার ভাবি সকলেই যে প্রথাগত জীবনকে বেছে নেবে তার কী কোন মানে আছে। এক একজন এক এক ভাবে জীবনটাকে দেখে।'

শ্যামাচরণ বলে, 'আসলে কী জানেন, একটা ঘটনা সে সামান্যও হতে পারে, অসামান্যও হতে পারে, সেটাই হয় তো একজনের জীবনের সমস্ত ছককে পাল্টে দিতে সাহায্য করে। আমার বেলাতেও তাই হয়েছে সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে যেমন বোঝানও যায় না, আবার তেমনি তর্ক করাও চলে না।'

রত্নেশ্বর বলেন, 'আমরা সব কিছু বিচার করি না বলেই বুঝি দুঃখ পাই, ভেঙে পড়ি, হতাশাগ্রস্ত হই। এটা রক্ত মাংসের মানুষ বলেই না হয়ে পারে না।'

সূর্যকান্ত একমনে সব কথা শুনছিল। হঠাৎ ও বলে বসল, 'আপনি আর মামা দু'জনাই আছেন যখন, তখন একটা অনুরোধ করবো, সেটা রাখবেন?'

'কী অনুরোধ সূর্যকান্ত?' রত্নেশ্বর বললেন।

সূর্যকান্ত বলল, 'তাহলে একটু আগে থেকে আপনাদের সব শুনতে হবে।'

দুজনাই এক সঙ্গে বলল, 'শুনবো নিশ্চয়ই।'

'মাকে আমার থেকে বেশি সম্ভবত আপনারা কেউ-ই চেনেন না।' সূর্যকান্ত বলেই ওদের দুজনের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

শ্যামাচরণ বলে, 'এক একজনের দেখার মধ্যেই বিস্তর পার্থক্য থাকে সূয্যি।'

সে কথায় রত্নেশ্বরও সায় দেন।

সূর্যকান্ত বলে, 'মৃদুলদা যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল মামা ছাড়া আমরা সকলেই ছিলাম। মা কি করেছিলেন মনে আছে?'

রত্নেশ্বর ভুরু কুঁচকে সব কিছু মনে করার চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারল না।

শ্যামাচরণ বলল, 'কী হয়েছিল, বলই না সূয্যি?'

সূর্যকান্ত খুব সুন্দর ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'মা অরূপ আর মিঠুকে জোর করেই মৃদুলদাকে হাসপাতাল থেকে এ বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন'।

'তাতে কী?'

'সেটাই তো আসল ব্যাপার। যে অরূপকে এ বাড়ির লোক সাধারণ বংশের ছেলে বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে, ওকেই কিনা মা পাঠালেন মিঠুর সঙ্গে সম্ভবত অরূপকে মর্যাদা দিতেই। সেদিন কিন্তু এ বাড়ির একটি প্রাণীও অরূপকে খারাপ চোখে দেখেনি বা দেখলেও কোন বিরূপ মন্তব্য করতে সাহস করে নি।

শ্যামাচরণ মৃদু হেসে বলল 'চারু যে কী ধাতুতে গড়া তা আমি জানি। সব কথা তো প্রকাশ করা চলে না।'

চারু ট্রেতে চা মিষ্টি সাজিয়ে এনে সেণ্টার টেবিলের ওপর রেখে রত্নেশ্বরকে লক্ষ করে বলল, 'নিন ঠাকুরপো, তুই ও নে দাদা।'

রত্নেশ্বরের শরীরে হঠাৎ কেমন কাঁপুনি শুরু হল। দুচোখের সাদা জমি ঈষৎ গোলাপী হয়ে উঠল।

তা দেখে চারু বলল, 'শরীর কি আপনার ভাল নেই নাকি?

রত্নেশ্বর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললেন, 'না বউঠান। হঠাৎ সুখে অনেকেরই এরকম হয়। এ বাড়িতে এ ডাক প্রথম শুনলাম বলেই বুঝি, একটু আবেগ এসে গিয়েছিল।

শ্যামাচরণ বলল, 'তা হ'লে বলবো, সব কৃতিত্ব মৃদুলের।'

মুহূর্তেই ঘরের পরিবেশ কেমন হয়ে গেল।

ওকে স্বাভাবিক করার জন্য চারু মুহূর্তেই তৎপর হয়ে উঠলো বলল, 'ও সব কথা থাক?'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে রত্নেশ্বর বললেন.' মিথ্যার দুর্গ আঁকড়ে একই পরিবারের দুটো অংশ এতদিন বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। নির্বুদ্ধিতারও একটা সীমা আছে। নিজেদেরকে কি বিশেষণ দেবো ভেবে পাচ্ছিনা। ঠিক এ সময় গণা মুখুজ্জে ঘরে ঢুকে সব কিছু দেখে বলল 'তোমরা সবাই বড় স্বার্থপর, আমার অনুপাস্থাততে তোমাদের গল্পের আসরে আাম নেই, এটা তোমাদের একবারও মনেই পড়ল না'।

রত্নেশ্বর বললেন।', পড়েছে বই কি। তুমিই তোএ বাড়ির এখন সবচেয়ে ভাইটাল ফোর্স।'

'দুর দুর' কাকে যে কী বল রত্নেশ্বর তার ঠিক নেই। প্রসঙ্গ পাল্টে ফের বলল গণা মুখুজ্জে 'দেখলে তো রত্নেশ্বর চারুর কাণ্ডটা। আমি প্রকৃতির হাওয়া গায়ে লাগিয়ে এলাম তো কি, চা থেকে বঞ্চিত হব কেন?'

রত্নেশ্বর বললেন, আগে স্থির হয়ে বসুন তো। গায়ের ঘাম শুখোক। মুখে হাতে জল দিন তারপর তো ও সব বিষ পান করবেন। চা খেতে খেতে বলবেন, 'আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।

হো হো হাসির সঙ্গে ঘরমুখর হলেও গণা মুখুজ্জে বললো, 'ওর হাতের সবই অমৃত বিষ হবে কেন রত্নেশ্বর?'

চারু সহাস্য ভঙ্গি করে বলে, 'ধৈর্য ধর মৃদুলের ওখান থেকে চট করে একটু ঘুরে আসি তারপর তোমাকে চা করে দেব।'

গণা মুখুজ্জে বলল দেখার কিছু নেই চারু। মিঠু যখন রয়েছে তখন তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারে '

তবুও · বলেই চারু ঘর ছেড়ে বেরোতে বেরোতে বলল 'সকালে ওর ওখানে না গেলে মৃদুল অভিমান করে খুব। আমি আসছি। বলেই বেরিয়ে যায় চারু।

গণা মুখুজ্জে শ্যামাচরণকে লক্ষ করে বলল, 'শরীর যে একদম ভেঙে গেছে দাদা?'

শ্যামাচরণ ধীর গলায় উত্তর দেয়, 'ও কিছু নয়। পরিশ্রম খুব বেড়ে গেছে তো। দিন কয়েক বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হঠাৎ পরিবেশটা পাল্টে গেল সন্তুর বিভৎস আর্তনাদে। ও যেন কোন মানুষের কণ্ঠস্বর নয়, কোন বন্য প্রাণীর, এরকমই মনে হ'ল সকলের 'মুখুজ্জেবাড়ির নিস্তব্ধতাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। 'ভো'-কাট্টা ভো-মারা! এই চিৎকারে বাড়ির আর কেউ না হোক শ্যামাচরণ আর রত্নেশ্বর উদ্বিগ্ন হল খুব।

গণা মুখুজ্জে ম্লান মুখ করে বলল, 'ও কিছু নয়। সন্তুটার ফের ক্ষ্যাপামি শুরু হয়েছে। বেচারা।'

রত্নেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে সন্তু?'

'নিমাইদার ছেলে। মনে আছে তো নিমাইদাকে। ওরই ছেলে সন্তু আর ঘণ্টু। ঘণ্টুর পরিচয়তো ইতিমধ্যেই পেয়েছ। সন্তু হচ্ছে ওরই বড় ভাই। গণা মুখুজ্জে সংক্ষেপে এই পরিচয় দিয়ে বিষণ্ন মুখে বলল। পুত্রবধূ করে নিমাইদা খুব রূপসী বউ এনেছিল। নীলা যেমন সকলের সয় না এ ঘটনাও ঠিক তেমনি। সন্তু একটা পাশও দিয়েছিল, কিন্তু কোন কাজকর্ম করতো না, নেশা ভাং করতো। তার উপরে, বউটাকে অত্যাচারও করতো খুব। একটা কথা আছে না, ঘট বুঝে সড়া, এ বাড়ির মেয়েরাও ঠিক তেমনি। মেয়েমহল বউটাকে নানান ধরণের কুচ্ছিৎ মন্তব্যে অতিষ্ঠ করতো। একদিন বউটা গয়নাগাটি নিয়ে সন্তুর ভাগনে কিশলয়কে সঙ্গে করে পালিয়ে গেল। সন্তু যত অমানুষই হোক কিশলয়কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। ওর লেখাপড়া, চাকরির সব বন্দোবস্ত সন্তুই করে দিয়েছিল। এ বাড়ির রক্তে, রক্তে পাপ, ভাগ্নে তার মামীকে নিয়ে চম্পট দিতে পারল। অবশ্য, একহাতে তালি বাজে না। সন্তুর বউটাও ছিল নষ্ট স্বভাবের। এ বাড়ির লোক ওদের কোন খোঁজই পেল না। প্রথম প্রথম সন্তু গুম মেরে বসে থাকত, কিন্তু পরে মাথাটাই গেল বিগড়ে। দিন নেই রাত নেই, ওই এক ডাক ওর মুখ দিয়ে বেরোয়। কিছুদিন ওকে লুম্বিনীতে রেখেছিল, ফিরে এল শান্ত হয়ে। মৃদুলের ঘটনার পর থেকেই ওর সেই পুরোন রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কি বা করতে পারি আমরা। মৃদুল সুস্থ থাকলেও না হয় কথা ছিল।' একটানা কথাগুলো বলে গণা মুখুজ্জে চুপ করে গেল।

রত্নেশ্বর উত্তর দিলেন, 'অত ভেবো না। আমরা তো আছি, 'প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যই বললেন, 'তারপর কী হল সূর্যকান্ত?'

সূর্য্য যেখানে শেষ করেছিল ঠিক তারপর থেকেই আণুপূর্বিক সব বলে যেতে লাগল। বলল, 'কোন স্ট্রেচার নয়, অরূপ ওকে কাঁধে করে ঘরে নিয়ে গেল। শুনেছি, যন্ত্রনার ছাপ মৃদুলদা কাউকেই দেখতে দেন নি। তবে হ্যাঁ, বাড়ির

সব লোক মুখ শুকনো করে ওই দৃশ্য দেখেছে। অনেকেই অরূপকে সে সময় সাহায্য করতে চেয়েছিল। কিন্তু অরূপ ওদের কথায় কোন গুরুত্বই দেয় নি। শুধু মিঠুকে পেছনে সতর্ক হয়ে থাকতে বলেছিল। আমি অবাক হয়ে যাই অরূপ কি করে এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে মৃদুলদাকে ওপরে নিয়ে এল ও ভাবে। মনের জোর, না, কাকা?'

গণা মুখুজ্জে বলল, 'এমন সর্বনাশ যে হবে ভাবতেই পারিনি। মানুষের জীবনের দেখছি, কানাকড়িও মূল্য নেই। সকলেই যেন প্রেতনৃত্যে ডুবে আছে। একি হ'ল রত্নেশ্বর?'

রত্নেশ্বর বললে, সবকিছুরই হয়তো প্রয়োজন আছে দাদা'।

গণা মুখুজ্জে 'বললেন, 'একটা জীবন রক্ষা করতে পারবো না, জীবন ধ্বংস করবো কোন অধিকারে?'

'অধিকার নয় দাদা। মোহান্ধ হলে যা পরিণতি হয়, এ সবই হচ্ছে তাই। দয়া, মায়া, প্রেম. ভালবাসা, শ্রদ্ধা এ সবই আছে. ঠিক ঘন কালো আকাশের আড়ালে। এসব থাকবে না, থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস সুদিন আসবেই। সূর্যকান্ত সে কথা শুনে হেসে বলল, 'তুমি ঠিক মাস্টার মশাইদের মত বলছো কাকা।'

রত্নেশ্বর বললেন, 'হয়তো তাই। তবু বলছি. এত নিরাশ হওয়ার, ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই।'

চারু ঘরে এল। গণামুখুজ্জের দিকে চেয়ে বলল, 'সামান্য দেরি হল, আর ক' মিনিট অপেক্ষা কর, চা দিচ্ছি।'

রত্নেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন বউদি?'

'ভালই'। 'বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে চা করায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ঘরে এটা সেটা নানান ধরণের কথাবার্তা চলছিল।

চারু চা নিয়ে এল। সূর্যকান্ত আর বেশি সময় ওখানে বসল না।

চা খেতে খেতে গণা মুখুজ্জে বলল মৃদুলের জেদ বড় বেশি। ও সব টাকা পয়সা নাকি বিলিয়ে টিনিয়ে নিঃস্ব হয়ে বসে আছে।'

রত্নেশ্বর বললেন, 'না দাদা, যা শুনেছ তার সবটা সত্যি নয়। ও বাড়িতে ভাল ভাড়াটে আমিই বসিয়েছে। মৃদুল নিজের জন্য চারখানা ঘর আটকে রেখেছে। যা হাতে পাতে আছে আর যা ভাড়া পাবে তাতে মনে হয় ওর কোনই অসুবিধে হবে না।

চারু বলে, 'ও সব নিয়ে আমি অত শত ভাবি না। শুধু ভাবনা সারা জীবন ও পঙ্গু না হয়ে থাকে। কিছুতেই মাদ্রাসে যাবে না। বলে, এখানে কী ভাল চিকিৎসক নেই, না, সকলেই মাদ্রাস চলে যাচ্ছে। আর দশ জনের যা হবে আমারও তাই হবে। নিজের সম্পর্কে ও এত উদাসীন হ'ল কেন সেটাই আমার

মাথায় ঢুকছে না।'

'রত্নেশ্বর আরও মিনিট দশ-পনেরো এ ঘরে কাটিয়ে এক সময় সূর্যকান্তকে ডেকে বললেন, 'এবার যাই, মৃদুলকে একটু দেখে আসি।'

ওরা যখন মৃদুলের ঘর মুখো হ'ল, তার একটু পরেই মিঠু নিজেদেরঘরে ঢুকল।

মিঠু বলল, 'ওখানে থেকে কী করবো। অরূপ এসে গেছে। আমার এখন ওখানে থাকার কোন মানেই হয় না।'

মৃদুল শুয়ে শুয়েই বলল, 'এত দেরী হল যে অরূপ?'

'তেমন তো দেরী হয় নি। বেশি হলেও পাঁচ-সাত মিনিট লেট।'

'ওটাই আমার কাছে অনেক বেশি সময় অরূপ।'

অরূপ বলল জানিতো ওরা আছে, তাই নিশ্চিন্ত।

'তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করছো কোথায়?'

'কেন? দুশ্চিন্তার কী কোন কারণ ঘটেছে?'

মৃদুল হেসে বলল, 'যারা জেগে ঘুমোয়, তুমিও দেখছি তাদেরই দলের, কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে ফের ও বলল 'তুরূপের শেষ তাসটা বের করতে এখনও দেরি করছো কেন?'

অরূপের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে যায় মুহূর্তে। বলে, 'শুয়ে শুয়ে এসব ভাবনাই ভাবা হচ্ছে বুঝি?'

'ভাবনা ছাড়া তো মানুষের চলে না অরূপ।'

'বেশ কথা দিচ্ছি তোমার ভাবনার শিগগির অবসান ঘটাব। তার আগে আমরাও যে অনেক ভাবনা জমে আছে।'

মৃদুল বলল, 'তোমার আবার কী ভাবনা?'

অরূপ বলে, 'মাদ্রাস কেন যাবে না তুমি?'

'যেহেতু কলকাতার চিকিৎসকদের ওপর এখনও বিশ্বাস আছে বলেই।'

'ডাঃ সামন্ত, ডঃ মিশ্র দেখে তোমাকে ওখানে যাওয়ারই পরামর্শ দিয়েছেন। নইলে আমি তোমার ওপরে জোর খাটতুম না।'

মৃদুল বলল, 'রত্নেশ্বর কাকা কিন্তু আমাকে একেবারই নস্যাৎ করেন নি। উনি ডঃ ভট্টাচার্যকে নিয়ে আসবেন বলেছেন। শেষ চেষ্টা করতে দোষ কী অরূপ।'

'বেশ তোমার কথা না হয় মানলুম। কিন্তু আগামী সপ্তাহেই যে আমাকে ট্রেনিং-এ যেতে হবে। তখন আর সময়ই পাব না। তোমাকে ছেড়ে যেতেও বড় দুশ্চিন্তা হচ্ছে মৃদুল'।

মৃদুল হো হো করে হাসে। বলল 'খুবই ভাল হ'ল। যত শিগ্গির তুমি ট্রেনিং এ যাও, এটা আমিও চাইছিলাম। আমি দিনক্ষণ ঠিক করেই রেখেছি। রত্নেশ্বর কাকা এ বাড়িতেই ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারকে নিয়ে আসবেন।'

'সে তো একমাসের নোটিশ দিতে হয়'।

মৃদুল হেসে বলে, 'ওসব রত্নেশ্বর কাকাই বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। বেআইনি কোন কাজ আমরা করবো না। একমাস আগেই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তুমি দয়া করে পরশুদিন বেলা দশটার মধ্যে এখানে আসতে ভুলবে না। ভুললেও বিজন সূর্যকান্তকে বলে রেখেছি। তোমার বাবা-মাকে নিয়ে আসার সব দায়িত্ব এ বাড়ির বড়দের।'

অরূপ কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বলে, 'তুমি একটা যাচ্ছেতাই।'

মৃদুল উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে হাসে শুধু।

রেজিষ্ট্রার মিঠু আর অরুপকে স্বামী-স্ত্রীর শপথ বাক্য পাঠ করালেন। ওরা নিঃসংকোচ সে সব কথা উচ্চারণ করে পরস্পরের মুখের দিকে চাইল। মালা বদল হল। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ধুম পড়ে গেল। শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনিতে মুখুজ্জে বাড়ির চেহারাই গেল পাল্টে।

আর একদিকে বিজন লাণ্টু, পরেশের শ্যামলরা জোর করে সন্তুকে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসাল। সন্তুর মুখ দিয়ে তখনও ভো-কাট্টা, ভো-মারা ছাড়া আর কোন শব্দই বেরোচ্ছিল না। গাড়ি দেরি করলো না। দ্রুত ধুলোবালি উড়িয়ে মেণ্টাল হসপিটালের দিকে ছুটে গেল সন্তুকে নিয়ে। গাড়ির ভেতরে বসেও সন্তু ওই একই কথা বলছিল, আর হাসছিল। যেন ও বলতে চাইল, ও হে সিমলের মুখুজ্জেরা দেখলে তো সবকিছুই একদিন ভো-কাট্টা ভো-মারা হয়ে যায়। খালি হাসে সন্তু আর ওই শব্দ দুটো বের করে বিকট ভঙ্গিতে। চোখ দুটো তখন ওর ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

বিজনরা ফিরে এল ঘণ্টা দুই পর।

মৃদুলের চোখে জল দেখে চারু বলল, 'কাঁদছো কেন মৃদুল ?'

'বড় সুখ চারু কাকীমা।'

নিজেকে যতটা সম্ভব গোপন রেখে চারু বাইরে বেরিয়ে এসে ডুকরে কেঁদে ফেলল। শ্যামাচরণ ওকে কাঁদবার সুযোগ দিল। পরে এক সময় চারুর পিঠে হাত রেখে বলল, 'সারাদিন বড় ধকল গেল। এবার কিছু মুখে দে চারু। তোর ব্রত সফল হল, একি কম কথা। আজই আমাকে চলে যেতে হবে। এতদিন হয়ে গেল, ওরা কেমন আছে কে জানে। এবার যেতে দে, অনুমতি দে চারু।'

চারু স্নিগ্ধ হেসে বলল, 'হাজার চারেক টাকা তোমার জন্য রেখেছি দাদা। ওটা নিয়ে যাও।'

শ্যামাচরণ বলল, 'দে তাহলে'।

টাকা নিয়ে শ্যামাচরণ মৃদুলকে দেখে বড় রাস্তায় এসে নামলো।

চারু টানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপলকে শ্যামাচরণকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ করল। শ্যামাচরণের শরীরের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে এক সময় মিলিয়ে গেল।